ISSN-0971-8435

বিশেষ সংখ্যা

যোজনা

ধনধান্যে

মার্চ ২০১৬ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹ ২০

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৬-১৭

ফোকাস

সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭ : কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার

সিএসসি শেখর

পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত

জি রঘুরাম

অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বিকাশের পূর্বাভাস রেখেঢেকে কেন?

ডিএইচ পাই পানান্দিকার

রেল বাজেট ২০১৬-২০১৭ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

শান্তি নারায়ণ

বিশেষ নিবন্ধ

কেন্দ্রীয় বাজেট কি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবে

ড. এনআর ভানুমূর্তি ও মণীশ কুমার প্রসাদ

সেতু ভারতম্ প্রকল্পের সূচনা

রাজমার্গ বা জাতীয় সড়কে সুরক্ষিত ও নির্ঝঞ্ঝাট যাত্রা সুনিশ্চিত করতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে সেতু ভারতম্ প্রকল্পের সূচনা করলেন। সেতু ভারতম্ প্রকল্পের লক্ষ্য ২০১৯ সালের মধ্যে সব কটা জাতীয় সড়ক 'রেলের লেভেল ক্রসিং-মুক্ত' করা। লেভেল ক্রসিংগুলোতে ঘনঘন দুর্ঘটনা ও মৃত্যু ঠেকাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এই প্রকল্পে ২০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করে লেভেল ক্রসিংগুলোতে মোট ২০৮টারও বেশি রেল ওভারব্রিজ বা আন্ডারব্রিজ নির্মাণ করা হবে : অন্ধ্রপ্রদেশ-৩৩, আসাম-১২, বিহার-২০, ছত্তিশগড়-৫, গুজরাত-৮, হরিয়ানা-১০, হিমাচলপ্রদেশ-৫, ঝাড়খণ্ড-১১, কর্ণাটক-১৭, কেরালা-৪, মধ্যপ্রদেশ-৬, মহারাষ্ট্র-১২, ওড়িশা-৪, পাঞ্জাব-১০, রাজস্থান-৯, তামিলনাড়ু-৯, উত্তরাখণ্ড-২, উত্তরপ্রদেশ-৯ ও পশ্চিমবঙ্গ-২২। ইতিমধ্যেই ৭৩টি রেল ওভার/আন্ডারব্রিজ নির্মাণের জন্য বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা পড়ে গেছে। আর এর মধ্যে ৬৪টি রেল ওভার/আন্ডারব্রিজ নির্মাণের জন্য চলতি (২০১৫-১৬) অর্থবর্ষেই অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; এগুলো নির্মাণের আনুমানিক খরচ ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

এছাড়াও আনুমানিক ৩০ হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রায় দেড় হাজার পুরনো ও জরাজীর্ণ সেতুর পর্যায়ক্রমে 'পুনর্নির্মাণ/প্রশস্তিকরণ/সংস্কার'-এর মাধ্যমে উন্নতি করা হবে। এই প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পরামর্শকারী সংস্থা নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও রাজমার্গ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই দরপত্র জমা করার আহ্বান জানিয়েছে; লক্ষ্য ২০১৬-র মার্চ মাসের মধ্যেই পরামর্শকারী পরিষেবার বরাত দেওয়ার কাজ সেরে ফেলা।

সড়ক পরিবহণ ও রাজমার্গ মন্ত্রক উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি ফর হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স'-এ ভারতীয় সেতু পরিচালন ব্যবস্থা (ইন্ডিয়ান ব্রিজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা আইবিএমএস)-ও স্থাপন করেছে। এর লক্ষ্য ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সড়কের প্রত্যেকটা সেতুর অবস্থা সমীক্ষা করে জায়-ভুক্ত (ইনভেন্টরাইজেশন) করা। এই কাজের জন্য ১১ পরামর্শকারী সংস্থা নিয়োগ করা হয়েছে। এ বছরের জুন মাসের মধ্যেই সমীক্ষার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ধরনের সবচেয়ে বড় তথ্য-ভাণ্ডার হবে এটা। এই তথ্য-ভাণ্ডার জাতীয় সড়কে অতিকায় আকৃতির ও অত্যধিক ওজনের দ্রব্য পরিবহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

মার্চ, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত — জি রঘুরাম — ৫
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা : বিকাশের পূর্বাভাস রেখেঢেকে কেন? — ডিএইচ পাই পানান্দিকার — ৮
- রেল বাজেট ২০১৬-১৭ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা — শান্তি নারায়ণ — ১১
- নারী সশক্তিকরণ ও জেন্ডার বাজেট : প্রেক্ষাপট কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৬-১৭ — ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য — ১৩
- রেল বাজেট ২০১৬-১৭ — অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় — ১৬
- ভারেতর কৃষি ও কৃষক-দরদি কেন্দ্রীয় বাজেট — ড. সগর মৈত্র — ২২
- শক্ত ভিতের সন্ধানে — অনিন্দ্য ভুক্ত — ২৮
- সংস্কার ও সামাজিক ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব : বাজেট ২০১৬-১৭ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্র — তপন কুমার ভট্টাচার্য — ৩১
- দেশের আর্থিক শৃঙ্খলার হালহকিকত — বি ভি মধুসূদন রাও — ৩৬
- সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭ : শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য সংস্থান — প্রতিভা কুণ্ডু — ৪০
- সাধারণ মানুষ, কর্পোরেট ক্ষেত্র ও রাজ্যগুলির জন্য করের হিসাবনিকাশ — জয়ন্ত রায় চৌধুরী — ৪৫
- গ্রামের পরিকাঠামো ও বিদ্যুদয়ন : ২০১৬-১৭ কেন্দ্রীয় বাজেট বিশ্লেষণ — হিরণ্ময় রায়, অনিল কুমার ও প্রসূম দ্বিবেদী — ৪৭
- স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৬ — ঊর্মি এ গোস্বামী — ৫০

বিশেষ নিবন্ধ

- কেন্দ্রীয় বাজেট কি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবে — ড. এনআর ভানুমূর্তি ও মণীশ কুমার প্রসাদ — ৫৩
- পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী বাজেট ২০১৬-১৭ : একটি পর্যালোচনা — উৎপল চক্রবর্তী — ৫৬

ফোকাস

- সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭ : কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার — সিএসসি শেখর — ৬০

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — ভাটিকা চন্দ্রা — ৬৩
- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৬৪

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

ভারত গড়ে তোলা

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বাজেটকে মূলত ‘কৃষকের বাজেট, দরিদ্রের বাজেট ও বিকাশের বাজেট’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর তা বলা হবেই বা না কেন? মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে প্রায় ১৭ শতাংশ অবদান ও দেশের কর্মীবাহিনীর ৫০ শতাংশকে নিয়োগ করার সুবাদে কৃষিক্ষেত্র আজও সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সরকারের ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার উদ্দেশ্য আপাতদৃষ্টিতে দূরঅস্ত মনে হতে পারে। তবে কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের জন্য এ বছরের বাজেটে বরাদ্দ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে ৪৫ হাজার কোটি টাকা করার লক্ষ্য কৃষকদের আয়-সুরক্ষার বিষয়ে খানিকটা আশ্বস্ত করা।

পরপর দু’বছর অনাবৃষ্টির জেরে কৃষকদের যেভাবে ভুগতে হচ্ছিল, এমন পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। সেচ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ‘প্রধানমন্ত্রী সিঁচাই যোজনা’-র কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে আরও ২৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই একই দিশায় আরেকটি বড় পদক্ষেপ হল রাষ্ট্রীয় কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংক (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বা নাবার্ড)-এর আওতায় ২০ হাজার কোটি টাকার একটা পৃথক সেচ তহবিল গড়ে তোলা। এ ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর ফসল বিমা যোজনার জন্য সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে।

জনমোহিনী হওয়ার বদলে এই বাজেটে অর্থনীতির মৌলিক ক্ষেত্রগুলোর ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে—শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাজেটে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গ্রামীণ ক্ষেত্রের ওপর। সব মিলিয়ে গ্রামোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে ৮৭,৯৬৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য এই বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌরসভার জন্য মোট ২ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা সহায়ক-অনুদান মঞ্জুর করা হয়েছে—অর্থাৎ, গড়ে প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হল, এবং প্রত্যেকটা স্থানীয় পৌরসভা ২১ কোটি টাকা করে পাবে। এই অঙ্ক গত পাঁচ বছরের তুলনায় ২২৮ শতাংশ বেশি। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের জন্য সাড়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ গ্রাম ও ছোট শহরের বিকাশে সাহায্য করবে। এর ফলে অ-কৃষি গ্রামীণ ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় গ্রামীণ রাস্তার জন্য বরাদ্দ, পরিকাঠামো ও সামাজিক ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ অবশ্যই কৃষকদের কল্যাণ ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

যোজনা

স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু কল্যাণের মতো সামাজিক ক্ষেত্রে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার সব ক’টা মন্ত্রক মিলিয়ে নারীদের জন্য এই বাজেটে মোট বরাদ্দ ৫৫ শতাংশ বাড়িয়েছে। দেশের মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় মহিলা ক্ষমতায়ন মিশনের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা, নির্ভয়া প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি, গ্রামীণ পরিবারের মহিলাদের নামে গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার জন্য ২ হাজার কোটি টাকা আলাদাভাবে বরাদ্দ করা, তপশিলি জাতি/উপজাতি ও মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য ‘স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া’ প্রকল্পে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ভারতকে দুনিয়ার ‘দক্ষতা রাজধানী’ (স্কিল ক্যাপিটাল) বানানোর অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করে এই বাজেটে দেশ জুড়ে দেড় হাজার বহুমুখী দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের দোরগোড়ায় উদ্যোগপতি হওয়ার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া সরকারের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

শিল্পমহলের আশা ছিল যে গত বছরের বাজেটে করা ঘোষণা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে করের ভিত্তি হার (বেস ট্যাক্স রেট) বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হবে। কিন্তু রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে, কোনও কর কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। তবে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র প্রসার বাড়াতে ও বাড়তি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে স্টার্ট-আপ (নব্য স্থাপিত) সংস্থাগুলোকে ৩ বছরের জন্য কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত আয়করদাতাদের মধ্যে এক দিকে স্বল্প আয়ের স্ব-নিয়োজিত মানুষদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতার ক্ষেত্রে কর ছাড়ের মাত্রা বাড়িয়ে তাদের একটু স্বস্তি দেওয়া হয়েছে; অন্যদিকে এই শ্রেণির করদাতাদের তালিকায় প্রথম ১ শতাংশের মধ্যে থাকা অতি-ধনীদের ওপর অতিরিক্ত ৩ শতাংশ অধিভার চাপানো হয়েছে। ভূতাপেক্ষ সংশোধনী এড়ানো ও কর আধিকারিকের নির্ণয়-ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে কর ব্যবস্থাকে সরল ও সুস্থিত করার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকার বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরর্জন করার দিশায় আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

বস্তুত, এক বলিষ্ঠ পরিকাঠামো লগ্নি আকর্ষণ করার জন্য পূর্বশর্ত। এ কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই বাজেটের এক বড় অংশ, ২ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সড়ক, রেল, বন্দর ও বিমানবন্দরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর এই বাড়তি গুরুত্ব বিকাশ ও কর্মসংস্থানকে ত্বরান্বিত করবে। নির্মাণকারী ও ক্রেতা উভয় পক্ষের জন্য কর ছাড় দিয়ে সুলভ মূল্যের আবাসনের ওপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, তা এই শিল্পক্ষেত্রেরও বিকাশে সাহায্য করবে।

স্পষ্টত, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ গড়া ও কর ব্যবস্থার সরলীকরণ সহ ন’টা স্তম্ভকে অবলম্বন করে সরকার এই নতুন অভিমুখের মাধ্যমে আসল ভারতের আসল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে, এবং দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের জন্য এক নতুন রূপরেখাও সৃষ্টি করেছে।❑

পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত

লগ্নি আকর্ষণ করার পূর্বশর্ত একটা সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় পরিকাঠামো ব্যবস্থা। এ কথা মাথায় রেখে বাজেটে এই ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। লিখছেন **জি রঘুরাম।**

দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সঠিক দিশায় এগিয়েছে এবারের বাজেট। কেন্দ্রীয় বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দ প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। এটা ভালো ইঙ্গিত। সবচেয়ে বেশি ৭০ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে জাতীয় সড়কখাতে। এর মধ্যে ১৫ হাজার কোটি টাকা তোলা হবে বন্ড বিক্রি করে।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের অন্যান্য খাতে বরাদ্দের অঙ্কটা কিন্তু ঠিক স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় বাজেটে দেখানো অঙ্কটাই কি বরাদ্দ! নাকি রেল ও রাজ্যগুলির বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ টাকা কেন্দ্রীয় বাজেটের অঙ্কে ঢোকানো হয়েছে। আমার বিশ্বাস, অর্থমন্ত্রকের এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকবে। বাইরে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

আমি মনে করি, মোট বরাদ্দের অঙ্ক হবে আরও বেশি। কেননা, রাজ্য ও পুরসভার মতো স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিও পরিকাঠামো বাবদ খরচ করে। রেলের কথাও ধরা দরকার। রেলের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে ৪৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য উৎস হচ্ছে, রেলের নিজস্ব আয় থেকে সংস্থান, বন্ড ও অন্যান্য ঋণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি।

কয়েকটি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম-সড়ক যোজনায় কেন্দ্রের বরাদ্দ ১৯ হাজার কোটি টাকা। আর রাজ্যগুলি দেবে ৮ হাজার কোটি টাকা। এ ধরনের আর একটি হচ্ছে মেট্রো প্রকল্প। এতে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকা।

সড়ক, রেল ও মেট্রো ছাড়া অন্যান্য বড় পরিকাঠামো প্রকল্পবাবদ বরাদ্দের অঙ্ক

ক্রম	প্রকল্প	বাজেট হিসাব ২০১৬-১৭ (কোটি টাকা)
১।	প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা	২০,০৭৫
২।	স্বচ্ছ ভারত অভিযান	১১,৩০০
৩।	দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা ও সংহক বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি	৮,৫০০
৪।	আমরুত বা ১০০ স্মার্ট সিটি উন্নয়ন মিশন	৭,২৯৬
৫।	জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প	৫,০০০
৬।	জাতীয় লগ্নি ও পরিকাঠামো তহবিল	৪,০০০
৭।	পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩,০০০
৮।	জাতীয় শিল্প করিডোর	১,৪৪৮
৯।	অন্তর্দেশীয় জলপথ	৮০০
১০।	সাগরমেলা	৪৫০
১১।	১৬০টি বিমানবন্দর চাঙ্গা করে তোলা (প্রতিটি)	৫০ থেকে ১০০

সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সড়ক ও রেল। এরপর আবাসন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, মেট্রো, বিদ্যুৎ ও শহরোন্নয়ন। তবে কিনা বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি চ্যালেঞ্জও কম নয়।

চ্যালেঞ্জ

প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, দেরি না করে প্রয়োজনমতো টাকা দেওয়া এবং সেই টাকা সদ্ব্যবহারের দিকে সরকারি নজরদারির ব্যবস্থা কতখানি এলেমদার। ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও জাতীয় গ্রাম-সড়ক উন্নয়ন সংস্থার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ অর্থ খরচে ততটা দড় বলে মনে হয় না। সংস্থার জন্য এবারের বাজেটে বরাদ্দ কমাটা তার প্রমাণ। একই কথা খাটে সাগরমেলার ক্ষেত্রে। দারুণ সব পরিকল্পনা আছে। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের মুরোদ নেই তেমন। গত মার্চে সড়ক পরিবহণ উৎকর্ষ পুরস্কার অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রীর বক্তব্য বেশ মনে রাখার মতো। সড়ক পরিবহণ ও সড়ক এবং জাহাজ মন্ত্রক উভয়ের দায়িত্বে আছেন পরিবহণমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন যে, জলবায়ু ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে দেশ সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে চায় জলপথে। এর পর রেল ও সড়ক। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সড়ক ক্ষেত্রে বেসরকারি লগ্নি টানতে এক হাইব্রিড মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্তর্দেশীয় জলপথ ও রেলের জন্য মানানসই এক সরকারি-বেসরকারি

অংশীদারিত্বে কাঠামো তৈরির জন্য কিন্তু আরও প্রস্তুতি দরকার।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কনট্রাকটর ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রমোটারদের প্রকল্প সম্পন্ন করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা আছে কি না? গত পাঁচ বছরে সড়ক ও মেট্রো ক্ষেত্রে বহু প্রোমোটার মাঝপথে পাততাড়ি গুটিয়েছে। কনসেশান বা সুযোগ-সুবিধার চুক্তি নিয়ে নানান জটের দরুন। এছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র ও জমি অধিগ্রহণ ইস্যু তো আছেই। সড়ক ক্ষেত্রে সংশোধিত হাইব্রিড মডেল এখন বেসরকারি উদ্যোগের কাছে উৎসাহজনক হবে বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য একই কথা বলা যাচ্ছে না, কেননা অধিকাংশ কনট্রাকটর বড় খুঁতখুঁতে। তারা সবদিক মেপেজুকে পা ফেলতে চায়। এল অ্যান্ড টি-এর মতো কিছু সংস্থা আবার শুধুমাত্র 'বিল্ড' বা নির্মাণে আগ্রহী। 'বিল্ড অ্যান্ড অপারেট' তাদের না-পসন্দ।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হল বিবাদ-বিসংবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির আইনি ব্যবস্থা আছে কি না। আইনি জটে আটকে বহু পরিকাঠামো প্রকল্প শেষ করতে দেরি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পরিকাঠামো প্রকল্পে বিবাদ মেটানোর জন্য জন উপযোগিতা (বিবাদ ফয়সালা) বিল আনার কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ছাড় বা বিশেষ সুযোগ-সুবিধের চুক্তিও খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা থাকছে। বহু সড়ক প্রকল্পে আইনি ঝুটঝামেলা ছাড়িয়ে সেগুলি চালু করার জন্য বর্তমান সরকারকে প্রশংসা করতে হয়।

ব্যাংক বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিকাঠামো প্রকল্পে ঋণ জোগানো হচ্ছে চার নম্বর চ্যালেঞ্জ। এসব ব্যাংকে অনুৎপাদনশীল সম্পদের পরিমাণ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে পরিকাঠামো সম্পদও পড়ে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাংকে ফের পুঁজি জোগানোর জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রেখেছেন অর্থমন্ত্রী। প্রয়োজনের তুলনায় অবশ্য এই অঙ্ক ঢের কম। এ দিয়ে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ জোগানোর ক্ষমতা তেমন একটা বাড়ানো যাবে না।

পঞ্চম চ্যালেঞ্জ হল প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য। প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বেশকিছু বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা বেড়েছে অনেক। এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানও পড়ে। পরিকাঠামো নিয়ে ভালো 'শিক্ষা'-র ক্ষেত্রে অবশ্য খামতি আছে এখনও। আমার জানার মধ্যে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়, গুটিকয়েক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আদানি ইনস্টিটিউট অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজমেন্ট স্নাতকোত্তর স্তরে পরিকাঠামো পড়ানো হয়। গবেষণা ও উন্নয়ন এগোতে পারেনি তেমন একটা। ভারত হচ্ছে বিশ্বে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সবচেয়ে বড় বাজার। বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞতাকে তত্ত্বের রূপ দেওয়ার প্রয়োজন তাই বলার অপেক্ষা রাখে না। 'রিভিজিটিং অ্যান্ড রিভাইটালাইজিং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার' সংক্রান্ত কেলকার কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হয় ২০১৫-র নভেম্বরে। এই রিপোর্টের কথায় :

সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ সরকারি-বেসরকারি অংশদারিত্বের জন্য গত বাজেটে ঘোষিত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছে। কমিটি একে জোর সমর্থন জানিয়েছে। উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান গবেষণা, পর্যালোচনা, সামর্থ্য বা ক্ষমতা তৈরি এবং চুক্তি ও বিবাদ নিষ্পত্তি বিধিনীতির পরিশীলিত, অত্যাধুনিক মডেল বানাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। ভারতে পরিকাঠামো প্রকল্প, নির্মাণ ও পরিচালনার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে উদ্যমী এ ধরনের এক প্রতিষ্ঠান। এর ফলে সব নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো পরিষেবা জোগানের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করতে সুবিধে হবে।

বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্প নিয়ে আমার জ্ঞানগম্যি থেকে মনে হয়, প্রজেক্ট স্ট্রাকচারিং, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস, ফাইন্যানশিয়াল ভায়াবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট, বিড ডকুমেন্টস প্রেপারেশন, টেন্ডারিং অ্যান্ড বিডিং প্রসেসেজ, কনসেশন এগ্রিমেন্টস, ফাইন্যানশিয়াল এনজিনিয়ারিং, রেগুলেটরি ইস্যুজ, মার্জারস অ্যান্ড অ্যাকুয়িজিসানস-এর মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার।

নীতি

পরিকাঠামো বাবদ ব্যয় থেকে উপযুক্ত প্রতিদান বা রিটার্ন মেলা চাই। চ্যালেঞ্জ উতরে পরিকাঠামো প্রকল্প সফল করার জন্য তাই সুচারু নীতি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ এবং লোকজনের নজরকাড়া কাজকর্মে হাত পড়ে আগে।

বর্তমানে জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ৯৬ হাজার কিলোমিটার। যা কিনা, দেশে মোট রাস্তার ২ শতাংশ। এটাকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করার জন্য জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ২ লক্ষ কিলোমিটারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অবশ্যই স্বাগত। জলপথের দিকে অবশ্য মানুষের ততটা চোখ পড়ে না। অন্তর্দেশীয় জলপথ ও উপকূলে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে তাই একটা গা-ছাড়া ভাব। আমার মনে হয় অন্তর্দেশীয় জলপথ নিয়ে ভাবনাচিন্তা বড় লম্বাচওড়া। বাস্তবে তা পূরণ করা কঠিন। জাতীয় সড়কে রেলের সব লেভেলক্রসিং তুলে দেবার প্রকল্পটি এক ভালো স্ট্র্যাটেজি।

আসা যাক, রেলের ক্ষেত্রে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রেল স্টেশন উন্নয়নের উদ্যোগ এক সঠিক পদক্ষেপ। টেন্ডার প্রক্রিয়া ও চুক্তি নিয়ে

সমস্যা অবশ্য এখনও জিইয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত, ভারতীয় রেল স্টেশন নিগমের ওয়েবসাইটে সাতটি স্টেশনের তালিকা আছে। এর মধ্যে ৩টির ক্ষেত্রে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বাদবাকিদের ক্ষেত্রে কোনও ডকুমেন্টেশন নেই। সুইস চ্যালেঞ্জ রুটের মাধ্যমে চারশোর বেশি স্টেশনকে উন্নত করার পরিকল্পনা আছে। সুইস চ্যালেঞ্জ রুট অনুসারে প্রতিযোগীর প্রস্তাবিত প্রকল্প আরও উন্নতভাবে করার প্রস্তাব দিতে পারে অন্য যে কোনও সংস্থা।

রেল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গড়ার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। নীতি তৈরি ও নিয়ন্ত্রণকে স্বতন্ত্র রাখতে এ ধরনের একটি স্বাধীন নিয়ামক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন বহুদিন থেকে বোঝা যাচ্ছে। এই কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য বিল তৈরি ও তা সংসদে অনুমোদিত হবার পর জানা যাবে সংস্থাটির গণ্ডি, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কতখানি থাকবে।

একশো শতাংশ গ্রামীণ বিদ্যুদয়ন (বাদবাকি ১৩,০১০টি গ্রাম ২০১৮-র ১ মে-এর মধ্যে) এবং সড়ক সংযুক্তির (২০২১-এর পরিবর্তে ২০১৯-এর মধ্যে অবশিষ্ট ৬৫ হাজার গ্রাম) ক্ষেত্রে স্পষ্ট নীতি থাকার দরুন এই বাজেটে যথেষ্ট ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। একথা খাটে আবাসনের ক্ষেত্রেও।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান, স্মার্ট সিটি ও বিমানবন্দর চাঙ্গা করার প্রকল্পে নীতি এখনও তেমন ধারালো নয়। আমি তাই এই তিন প্রকল্পে বরাদ্দের ব্যাপারে নিশ্চিত নই। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন আনা জরুরি। স্মার্ট সিটির ধ্যানধারণা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কিছুটা এগোনো দরকার। বেশকিছু চালু বিমানবন্দর চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বিমান ওঠানামা কম। চলছে লোকসান। তা সত্ত্বেও, এতগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া বিমানবন্দর, ফের খোলার দরকারটা বোঝা যাচ্ছে না।

যাত্রী পরিবহণ সংক্রান্ত নীতি ঘোষণাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ :

পারমিট-রাজ খতম করা হবে আমাদের মাঝারিকালীন লক্ষ্য। সরকার মোটরযান আইন সংশোধন করবে। সড়ক ক্ষেত্রে যাত্রী পরিবহণের অংশটি খুলে দেওয়া হবে। উদ্যোগীরা বিভিন্ন রুটে বাস চালাতে পারবে। সুরক্ষা বিধি মেনে এবং দক্ষতার সঙ্গে। এতে উপকার অনেক। আরও দক্ষ জনপরিবহণের ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। মুমূর্ষু এই ক্ষেত্রে হবে নয়া লগ্নি। তরুণদের জন্য জুটবে কাজ। উঠে আসবে স্টার্ট আপ বা নতুন উদ্যোগীরা। এসবের সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রভাব পড়বে অর্থনীতি ও সমাজে। আমাদের আরও দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাবে।

নীতিতে বলা হয়েছে রাজ্যের পছন্দ করার অধিকার থাকবে। এটা অর্থহীন কথা। সড়ক ক্ষেত্র রাজ্য তালিকাভুক্ত। রাজ্যের এ অধিকার তো এখনই আছে।

আগের নীতিগুলো খুব একটা ভেবেচিন্তে করা হত না। যেমন, আগে আসবে, আগে পাবে অর্থাৎ ফার্স্ট কাম, ফার্স্ট সার্ভ ভিত্তিতে টু জি স্পেকট্রাম বিলিবণ্টন। এর ফলে ঘটে যায় বড়বড় এক কেলেঙ্কারি।

পর্যালোচনা

অর্থনৈতিক সমীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে অর্থনীতির হালহকিকত তুলে ধরে। আগের বাজেট কিন্তু খতিয়ে দেখা হয় কদাচিৎ। বৃহত্তর স্তরে বাজেটের হিসেব বনাম সংশোধিত ও প্রকৃত ব্যয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট খাতে সহায়ক নীতির পাশাপাশি বরাদ্দের পরিমাণ ও প্রকৃত ব্যয় বুঝতে এটা সাহায্য করে। উদাহরণ, আগের বাজেটে অন্তর্দেশীয় জলপথে বরাদ্দ ছিল অনেকটা বেশি। প্রকৃত ব্যয় কত হয়েছিল তা কিন্তু স্পষ্ট নয়।

নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যয়ের রিটার্ন বা ফল খতিয়ে দেখা দরকার। পরিকাঠামোয় খরচ ঠিক দিকে করতে তা সক্ষম করবে।❑

[লেখক অধ্যাপক, পাবলিক সিস্টেমস গ্রুপ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, আহমেদাবাদ।]

অর্থনৈতিক সমীক্ষা

বিকাশের পূর্বাভাস রেখেঢেকে কেন?

বিশ্ব বাজারে আর্থিক মন্দা চলছে। সেই তুলনায় ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা বেশ স্থিতিশীল। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সমীক্ষার পূর্বাভাস রক্ষণশীল। বর্তমান নিবন্ধে লেখক **ডিএইচ পাই পানান্দিকার** *এই সম্পর্কেই আলোচনা করে দেখিয়েছেন কীভাবে বিকাশহার বাড়ানো সম্ভব।*

অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বাজেটের প্রেক্ষাপটের রূপরেখা নির্ণয় করে। এই সমীক্ষা অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ আর বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার পাশাপাশি সেই সব বিশদ নীতিগুলির দিকে ইঙ্গিত করে যেগুলি অর্থনীতিকে এক সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বাজেট সাধারণত অর্থনীতিকেও কিছুটা ছাড়িয়ে যায় এবং খরচ ও সম্পদ জোটানোর অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বাজেট প্রধানত অর্থমন্ত্রকের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে, অন্যান্য দপ্তরেরও চিন্তাভাবনা এতে প্রতিফলিত হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বর্তমান বছরের ক্ষেত্রে তার প্রত্যাশাটি একটু বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে প্রমাণিত হওয়ার পর এবার ২০১৬-১৭-র অর্থবর্ষের জন্য বিকাশের হার ৭-৭.৫ শতাংশ থাকবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। হয়তো, বর্তমানের বিশ্ব জোড়া আর্থিক মন্দা পরিস্থিতি যেটা আগামী বছর যে কোনও দিকেই ঘুরে যেতে পারে, সে সম্পর্কে আগে থেকে অনুমান করা হয়নি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত এখনও স্থায়ী, তুলনামূলকভাবে উচ্চ বিকাশ নিয়ে স্থিতিশীলতার একটা আশ্রয় হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের সম্ভাবনা এক্ষেত্রে ৮-১০ শতাংশ হতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়।

বিশ্বের অন্যত্র কিন্তু ছবিটা নিতান্তই বর্ণহীন। জাপান ও ইউরোপ মন্দার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশ ২০১৫-র শেষ ত্রৈমাসিকে ঝুলে গেছে। এমনকী, ব্রিকস-ভুক্ত দেশগুলিও সমস্যায় পড়েছে। ব্রাজিল ও রাশিয়ায় বিকাশের হার নেমে –৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাও একইরকম বিপর্যস্ত। চীন তার আগের ১০ শতাংশের বেশি বিকাশহার থেকে নেমে ৬.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

কোনও দেশই বিশ্বের অন্যান্য দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। বাণিজ্য ও বিনিয়োগঘটিত সম্পর্কের দরুন নানা দেশ একে অপরের সঙ্গে অমোচনীয়ভাবে জড়িত। যেসব দেশ বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রপ্তানির পথটিকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে, তারাই প্রথম প্রতিযোগিতার দৌড় থেকে সরে যায়। ভারতের প্রাথমিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আমদানি প্রতিস্থাপনের নীতির ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল, যেটা ১৯৯৯-এর সংস্কারের পর প্রভূত চেষ্টা সত্ত্বেও রপ্তানি উন্নয়নের দিকে কার্যকরীভাবে বদলে ফেলা যায়নি আর, এখন 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ফলে আরও বৈচিত্রমূলক আকার নিয়েছে। দেশজ পরিচালকদের ওপর নির্ভরতার দরুন বিশ্বের অন্যদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বেশ ক্ষীণ। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশহারের ১ শতাংশ হ্রাসের ফলে ভারতের বিকাশ ০.২ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়। তবে, ২০০৮-০৯-এর সংকটের মতো ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে এই প্রভাব সত্যিই বিপর্যয়মূলক হয়ে উঠতে পারে।

আন্তর্জাতিক মন্দা সত্ত্বেও ভারতের বিকাশ ধরে রাখার পেছনে কি রয়েছে? সমীক্ষায় বেশ কয়েকটি ছোট ছোট উৎসাহমূলক কারণের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যেমন—কেন্দ্রে দুর্নীতি প্রায় বিলোপসাধন, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আরও বেশি সংখ্যক ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, ব্যবসা করার খরচ কমানো, জন-ধন যোজনা এবং সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রকল্প চালু করা ইত্যাদি। তবে, এই সব পদক্ষেপগুলির ফলে বিনিয়োগের তেমন কোনও বৃদ্ধি কিন্তু ঘটেনি।

শিল্পক্ষেত্রে বিকাশ ছিল তুলনামূলকভাবে স্থির এবং মোট দেশীয় উৎপাদনে এর অবদানটা ১৫-১৬ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কর্পোরেট ক্ষেত্র কোনও রকমে নিজের ভূমিকাটা ধরে রাখলেও বর্তমান বছরে তার নিজের লাভযোগ্যতা হারিয়েছে। চাহিদার অভাবে এই ক্ষেত্র অতিরিক্ত ক্ষমতা নিয়ে এখন সমস্যায়। কর্পোরেট ক্ষেত্র এবং একইভাবে যেসব ব্যাংক থেকে তারা ঋণ

নিয়েছে, তারা সকলেই এখন সমস্যাপীড়িত সম্পদের মোকাবিলায় ব্যতিব্যস্ত।

কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক বেশি গতিশীলতার পরিচয় দিয়েছে। পরিষেবা ক্ষেত্র আর্থিক এবং সরবরাহমূলক দুই বিভাগের দুর্দান্ত নৈপুণ্যের ফলে অর্থনীতিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 'স্টার্ট আপ'-গুলি ভারতে নতুন ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের বৃদ্ধি পর্যাপ্ত না হলেও গতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যথেষ্টই। কী কারণে অর্থনীতির গতি অক্ষুণ্ণ তা হয়তো বা আগের দিকের বছরগুলিতে উচ্চ হারে বিনিয়োগের পরিণাম।

অর্থনীতিকে আবার চাঙ্গা করে তুলতে হলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার যার ফলে চাহিদা বাড়বে। এই ক্ষেত্রে একটা কার্যকরী উপায় হল রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরিকাঠামো বিকাশে লগ্নি করা, কারণ, একদিকে যেমন এর প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে আর অন্যদিকে এর 'মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট'-ও অত্যন্ত বেশি।

বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমে যাওয়ার একটা কারণ হল চড়া সুদের হার। রিজার্ভ ব্যাংক আগে এই হার বাড়িয়েছিল উচ্চ হারে মুদ্রাস্ফীতির জন্য। কারণ, এটি ২০১০-১১ পরবর্তী চার বছরে তা অর্থনীতিকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এই পর্যায়ের বিনিয়োগও ছিল যথেষ্ট বেশি। এছাড়া, কৃষিজপণ্য মূলত ফলজাতীয় পণ্যের অপর্যাপ্ত জোগানের দরুনই মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে।

গত দু বছরে মুদ্রাস্ফীতি ছিল মাঝারি মাত্রায়। পাইকারি মূল্যসূচকের হিসাবে এটা ছিল ঋণাত্মক। আর, খুচরো দামের নিরিখে মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশের নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক রেপো রেট-কে নিরন্তর কমিয়ে ৬.৭৫ শতাংশে দাঁড় করালেও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণগ্রহীতাদের কাছে সেই সুযোগটা তেমনভাবে পৌঁছে দেয়নি। সমীক্ষায় দুর্দান্ত বিকাশহার অর্জনের জন্য মুদ্রানীতির হারগুলি কমিয়ে নগদের সহজলভ্যতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে।

ভারত যদিও রপ্তানিকে বিকাশের চালক হিসেবে ব্যবহার করেনি, বা বলা ভালো, করার সুযোগ পায়নি, রপ্তানি এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, শিল্পক্ষেত্রে তারা এখনও বিক্রির দিক থেকে গড়ে ১২ শতাংশ দিয়ে থাকে। গত ১৪ মাসে রপ্তানি ক্ষেত্রে যথেষ্ট মন্দা ঘটেছে বিশ্বের আর্থিক অবস্থার অবনতির দরুন। এছাড়া, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ-এর সুদের হার বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়ার ইঙ্গিতের ফলে প্রায় প্রতিটি মুদ্রারই অবমূল্যায়ন ঘটেছে। কারও কারও ক্ষেত্রে এই মূল্য হ্রাস অন্যদের চেয়ে বেশি। টাকার দাম তার আগের সর্বনিম্ন মাত্রার পারদ কাছাকাছি চলে গেলেও, সেটা অবশ্য রপ্তানি বাড়াতে আদৌ সহায়তা করেনি। তার কারণ, আমাদের প্রতিযোগীদের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটলেও আমরা এক্ষেত্রে কোনও সুবিধা পায়নি। মুদ্রামানের এই লড়াইয়ের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাংকে টাকার মূল্য এমনভাবে সামলাতে হবে, যাতে আমরা আমাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতাটা না হারাই। এই ধরনের ঝুঁকির মুখে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক রপ্তানি কমে যাওয়া সত্ত্বেও চলতি খাতায় ঘাটতি কেবলমাত্র ১.১ শতাংশ। এর কারণ, আংশিকভাবে পরিষেবাগত রপ্তানি (তথ্য-প্রযুক্তি ও তথ্য-প্রযুক্তি সংক্রান্ত পরিষেবা)-র সাফল্য আর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে আমদানি কমে যাওয়াটাও অংশত দায়ী। ব্যারেল প্রতি তেলের দাম বর্তমানের ৪৫ ডলারের তুলনায় ২০১৬-১৭-তে ৩৫ ডলারে দাঁড়াবে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে।

মূল প্রশ্নটা হল, বিকাশকে ধরে রাখতে আর বরং বাড়াতে কী কী নীতিগত প্রয়াসের প্রয়োজন হবে। বিকাশহার অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক হবে না, কারণ, বিকাশের গুণিতক প্রভাব ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়বে এবং বিনিয়োগও কমে আসবে বলে বোঝা যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট সংহতির পক্ষেই স্পষ্ট মত দিয়েছেন এবং পরিকল্পিত-ভাবেই বাজেট ঘাটতিকে জিডিপি-র ৩.৫ শতাংশে বেঁধে রেখেছেন। তবে, এই মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন সেটা হল, সরকারি ব্যয়ের মাধ্যমে চাহিদার সঞ্চার ঘটানো আর সেই সঙ্গে আক্রমণাত্মক উপায়ে সংস্কারের বিকাশ ঘটানো।

২০১৬-১৭-র বাজেটে 'এক পদ, এক পেনশন'-এর জন্য খরচের সংস্থান রাখতে হয়েছে এবং সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, বেতন ও ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হল, খরচের গুণমান। তিনটি অঞ্চল যেখানে ব্যয় বাড়ানো দরকার। আর যেসব ক্ষেত্রে বাজেট প্রকৃতপক্ষে সুযোগ দিয়েছে সমীক্ষায় সেইসব ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রথমটি হল, শিক্ষা। শিক্ষার অভাবে শ্রমিকরা যেসব কাজ করবে সেগুলির উৎপাদনশীলতা কম হবে আর পরিণামে সেগুলি হবে কম লাভজনক।

দ্বিতীয়টি হল, স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি অনেক বেশি উৎপাদনশীল, তাঁকে ওষুধের জন্য কম খরচ করতে হয়। আর তাই তাঁর খরচ করার ক্ষমতাও থাকবে বেশি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মিলে উন্নয়নের সফট-ওয়্যার গড়ে তুলেছে। আর সমীক্ষায় যেমন দেখানো হয়েছে, বিকাশের পথ এদেরই দেখাতে হবে। অধিকাংশ দেশেরই অভিজ্ঞতা হল এটাই।

তৃতীয় হল, কৃষি। সমীক্ষায় জিনগতভাবে সংশোধিত শস্য এবং উন্নত সেচ, খামারের যান্ত্রিকীকরণ, উন্নত বাজার ও কাঁচামালের জোগান অব্যাহত রেখে উৎপাদনশীলতা ও খাদ্য সুরক্ষা বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।

তবে, বাজেটে অনুৎপাদী এবং কম উৎপাদনশীল খরচ বিশেষ করে ভরতুকি

কমানোর কোনও প্রয়াস নেই। সমীক্ষায় এই বিষয়টির দিকে লক্ষ দেওয়া হয়েছে এবং উদ্দিষ্ট দুর্বলতর শ্রেণিকে যা কোনও সুফল দেয় না, সেগুলির ক্ষেত্রে ভরতুকির বিলোপসাধনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই সমীক্ষায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, সম্পন্নদের জন্য যেসব ভরতুকি চালু আছে, সেগুলির প্রত্যাহার করা উচিত। এগুলি স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প, রান্নার গ্যাস, রেল, বিদ্যুৎ, বিমান জ্বালানি, সোনা এবং কেরোসিন প্রভৃতির ওপর ছাড় তুলে নিতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে যার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, সম্পন্ন কৃষকদের কৃষিজ আয়ের ওপর আয়কর বসানো এবং সারের ভরতুকি যুক্তিসম্মত করা।

আপাতদৃষ্টিতে এই সব পরামর্শ অর্থমন্ত্রীর কাছে আদৌ রুচিকর বলে নাও মনে হতে পারে, কারণ, সংসদে তাঁকে দৃঢ় সংকল্প বিরোধীদের মুখোমুখি হতে হয়। আর, তাঁর দলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে লড়তেও হবে। এমনকী, জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে যেসব জরুরি ও প্রগতিশীল সংস্কার রূপায়ণ প্রয়োজন, সেগুলিও রাজ্যসভায় গৃহীত হয়নি।

খরচের টাকাটা যথাসম্ভব আসা উচিত প্রধানত কর-রাজস্ব থেকে। আর, যখন অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন ঋণবাবদ অর্থ থেকে। সমীক্ষায় দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ভারত হল সবচেয়ে কম কর-যুক্ত দেশ। কর-রাজস্ব ও জিডিপি-র অনুপাত এ দেশে মাত্র ১৬.৬ শতাংশ, যেখানে ব্রিকস্ দেশগুলির ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি, যেমন—চীনে ১৯.৪, রাশিয়ায় ২৩ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৮.৮ শতাংশ এবং ব্রাজিলে ৪৫.৬ শতাংশ। কিন্তু, মাথাপিছু আয়ের নিরিখে করের অনুপাতটা আদৌ কম নয়। সমীক্ষায় অকাট্যভাবে দেখানো হয়েছে যে, গত ২৫ বছরে কর ছাড়ের সীমাটা মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে।

বিশেষ করে, চারটি ক্ষেত্রের সংস্কার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে। জমি বিলটি সরকারি-বেসরকারি দুই ধরনের সংস্থাতেই লগ্নির উপায় হিসেবে এসেছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলি প্রায় ২৫ শতাংশই জমি অধিগ্রহণের সমস্যার দরুন আটকে গেছে। জিএসটি নিয়ে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বিতর্ক চলেছে আর এই বিলটিও ঝুলে রয়েছে বিকাশের গতিরোধ করে। কেবল জিএসটি চালু হলেই মোট দেশীয় উৎপাদন জিডিপি-র বিকাশ অন্তত ১ শতাংশ বাড়ত। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার একটি বড় কারণ হল 'বিদায় নীতি'। অবাধ প্রবেশ একই সঙ্গে অবাধ নির্গমনেরও ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটি না থাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সবশেষে হল শ্রমনীতি, সমীক্ষা যেটির পরিবর্তনের প্রয়োজনের উল্লেখ করেছে, আরও ভালো গুণমানের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে।

সুতরাং, বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি, স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার উপায় কী?

সমীক্ষায় এ ব্যাপারে যেসব নীতিগত পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে :

- বিকাশকে আরও বেশি করে দেশজ চাহিদার ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। আর, দেশের চাহিদা বাড়বে পরিকাঠামোর ওপর ব্যয় বাড়ালে।
- সোনা, স্বল্প সঞ্চয়ে সুদের হার, পেনশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ভরতুকি কমিয়ে দেওয়া প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা সচ্ছল শ্রেণির সুবিধা কমানোর জন্য ১ লক্ষ কোটি টাকার ভরতুকি হ্রাস।
- করের ভিত্তি সম্প্রসারিত করা, যার অর্থ ব্যক্তিগত কর ছাড়ের সীমা বাড়ানো উচিত হবে না।
- খরচের ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার যুক্ত ক্ষেত্রগুলি হবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি।
- ধনী কৃষকদেরও করের আওতায় আনতে হবে কৃষিজ আয়কে আয়করের মধ্যে এনে।
- সারের ভরতুকি যুক্তিসংগত করতে হবে, কারণ, এটা প্রধানত বড় কৃষকদেরই সুবিধা দেয়।
- রিজার্ভ ব্যাংকে তার অংশীদারিত্ব মূলধন ১৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে হবে এবং সেই সঙ্গে ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে মূলধনের জোগানোর অর্থও কমিয়ে দিতে হবে।
- শ্রম আইনের সংস্কার ঘটাতে হবে আরও ভালো গুণমানের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে।

সমীক্ষায় উন্নয়ন সম্ভাবনার দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বুনিয়াদি অর্থনৈতিক এবং লভ্যাংশগত দিক থেকে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও ওপরে উল্লেখ করা ব্যবস্থাগুলি উচ্চ ও স্থিতিশীল বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলবে। সমীক্ষায় ৭-৭.৭৫ শতাংশ বিকাশের যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তা মূলত এটা ধরে নিয়ে যে ওই ব্যবস্থাগুলি রূপায়িত হবে না এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত হবে না। এই কারণেই অর্থনৈতিক সমীক্ষা এক্ষেত্রে সাবধানী পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে আবার ভুল না হয়।❑

[লেখক FICCI-র প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল। বর্তমানে RPG ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট।]

রেল বাজেট ২০১৬-২০১৭ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

পুঁজির অভাবে ধুঁকতে থাকা রেলে বিপুল বিনিয়োগ, রাজ্যগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ তথা ভরতুকি ব্যবস্থার পর্যালোচনার ইত্যাদি পদক্ষেপের মাধ্যমে রেলকে ফের লাভের মুখ দেখাতে চেয়েছেন রেলমন্ত্রী। সেই সঙ্গে বাজেটে রয়েছে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যেরও ঢালাও প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও ভাড়ার কাঠামো যুক্তিসংগত না করে যে হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়া হল তাতে আমজনতা খুশি হতে পারে, কিন্তু আখেরে রেলের ক্রমবর্ধমান লোকসানের বহর সামলানো যাবে তো? আলোচনা করেছেন **শান্তি নারায়ণ।**

বিভিন্ন সহায়সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে রেলের পরিকাঠামো মজবুত করার ব্যতিক্রমী পথে হাঁটার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য রেলমন্ত্রীর সাধুবাদ প্রাপ্য। এতে জাতীয় এই পরিবহণ নেটওয়ার্কের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিপুল পুঁজি ঢালার প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত বিনিয়োগের অভাবে প্রধান প্রায় সমস্ত রুটেই রেল লাভের অভাবে ধুঁকছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না। ২০১৪-১৫ সালে রেলে যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৬০ হাজার কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ সালে রেলমন্ত্রী এই বিনিয়োগ বাড়িয়ে করেন ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে এই বিনিয়োগ বাড়ানো হয় ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকায়। ২০২০-২১ সালে শেষ হওয়া পাঁচ বছরে যে মোট ৮.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে এই ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা তারই অঙ্গ। এই বিনিয়োগ সম্ভব হলে তা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় তিনগুণ বেশি হবে।

বিনিয়োগ করা অর্থ যাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লাইনের সম্প্রসারণে বা সামর্থ্য বৃদ্ধির কাজেই ব্যয় হয়। তা বাজেটে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে. সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি বিশেষ সংস্থা (স্পেশাল পারপাস ভেহিকল) গড়ে বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগে রাজি না হলে লাভজনক নয় এমন সমস্ত প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হবে। ডবল লাইন পাতা, ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরগুলি চালু করা, এবং বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ গড়ে তোলা-সহ সামর্থ্য বৃদ্ধির অন্যান্য কাজের নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য বরাদ্দ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্ববর্তী ছয় বছরে যেখানে দৈনিক গড়ে ৪.৩ কিলোমিটার লাইন পাতার কাজ হয়েছে সেখানে আগামী তিন বছরে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৩ কিলোমিটার লাইন পাতার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

এবারের রেল বাজেটের অন্যান্য ইতিবাচক দিকগুলি হল :

টিকিট কাটার ব্যবস্থা সহজ করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, রেল স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য চলন্ত সিঁড়ির তথা যাত্রীদের বিশ্রামকক্ষ ও বয়স্কদের ন্য ছোট গাড়ির ব্যবস্থা।

রেলে উন্নত মানের ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার-দাবার পরিবেশনে পেশাদারিত্ব আনতে এই কাজের দায়িত্ব ধাপে ধাপে IRCTC-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। IRCTC দ্বারা পরিচালিত ভোজনালয়ের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে। ই-কেটারিং-এর সুবিধা এই বাজেটের এক উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ।

রেল উড়ালপুল (ROB) ও ভূগর্ভস্থ পথ (RUB) নির্মাণ করে মানববিহীন বা মানুষের দ্বারা পরিচালিত লেভেলক্রসিং একেবারে তুলে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। এই পদক্ষেপ রেল দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন রেল দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ শতাংশ মৃত্যুই ঘটে বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং-এ।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ তথা রূপায়ণ কার্যের ওপর নজরদারি চালানো যায় সেজন্য রেল পর্ষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে একটি বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। সাতটি মিশনকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং একজন মিশন অধিকর্তার অধীনে একটি করে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন দল (ক্রশ ফাংশনাল এমপাওয়ার্ড টিম) নিজ নিজ মিশনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে রেল পর্ষদের চেয়ারম্যানের কাছে সরাসরি প্রতিবেদন জমা দেবে। ফলাফলভিত্তিক বার্ষিক কাজের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য মিশন অধিকর্তারা দায়বদ্ধ থাকবেন।

এই সাতটি মিশনের মধ্যে একটি হল রেলের সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারবিষয়ক। পণ্য চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট রেলপথ বা ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরগুলি চালু হয়ে যাওয়ার পর রেলের সেই নতুন সামর্থ্যের কীভাবে সদ্ব্যবহার ঘটানো হবে তার পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই মিশনের ওপর। এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পণ্য পরিবহণে রেল বর্তমানে যেভাবে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে সে বিষয়টি মাথায় রেখে পণ্য পরিবহণের পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণে সহায়সম্পদ সৃষ্টি করা যায়। তাহলেই লাভের মুখ দেখবে রেল। পণ্য পরিবহণের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে গেলে রেলপথে বড় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পার্সেল, গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন নতুন যে রেলপথ তৈরি হচ্ছে তাতে নতুন ধরনের সমস্ত পণ্যের পরিবহণ নিশ্চিত করার জন্য নতুন বিপণন কৌশল তৈরি করতে হবে। নিম্নোক্ত কৌশলগুলির কথা ভেবে দেখা যেতে পারে—

(ক) বর্তমানে রেল যে মোট ২০ শতাংশ EXIM কন্টেনারযুক্ত রেক চালায় তার বদলে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে এই ধরনের রেকের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ করা যেতে পারে। কন্টেনার সংস্থাগুলির ওপর নিয়মিত পরিবহণ মাশুল বাড়ানোর ফলে কন্টেনারে বহনযোগ্য বেশিরভাগ পণ্য সড়কপথে চলে যাচ্ছে। এই প্রবণতা বন্ধ করা দরকার।

(খ) পার্সেল-সহ দেশীয় পণ্যের যে বড় অংশ এখন জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে অলাভজনক মূল্যে সড়কপথেই দূরপাল্লার গন্তব্যে পাড়ি দিচ্ছে সেই সব পণ্যকে রেলের বহুমুখী পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(গ) মহাসড়ক ও শহরাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাতে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। রেলের পাটাতনের ওপর পণ্যবাহী ট্রাক পরিবহণের মাধ্যমে সড়কপথের ব্যস্ততা অনেকটাই কমানো যায়।

(ঘ) পণ্যমাশুল স্থির করে প্রান্তিক ব্যয় পুরোপুরি উশুল করার নীতি গ্রহণ করা দরকার। সেই সঙ্গে ওয়াগনের পরিবহণ ব্যয় যথাসম্ভব কমানোর জন্য পুরো ব্যয় বণ্টনের পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে স্থির ব্যয়ের একাংশ উশুল করে নেওয়াও যেতে পারে।

(ঙ) সড়কপথের পণ্যসামগ্রীকে আবার রেলপথে ফিরিয়ে আনার কৌশল হিসাবে একসঙ্গে অনেক পণ্যসামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বাঁধা গ্রাহকদের পণ্যমাশুলে ছাড় দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

বহু ইতিবাচক দিক সত্ত্বেও ভাড়ার কাঠামোকে যুক্তিসংগত করার বিষয়টি অবহেলিত রয়ে গেছে এই বাজেটে। যাত্রী চলাচল ক্ষেত্রে রেলের লোকসানের বহর প্রায় ৩০ হাজার টাকার। পণ্যমাশুল বাবদ আয় হওয়া অর্থ দিয়ে দিনের পর দিন যাত্রী চলাচল ক্ষেত্রের লোকসান পোষাতে হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে শহর বা শহরতলির ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়ায় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ফলে লোকসানের বহর সামলাতে ক্রমাগত পণ্যমাশুল বাড়াতে হয়েছে। ভারতীয় রেলে বর্তমানের পণ্যমাশুল আন্তর্জাতিকমহলের তুলনায় দ্বিগুণের বেশি। ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যমহলের কাছে পণ্য পরিবহণের জন্য রেলপথ ক্রমশই অলাভজনক হয়ে উঠছে।

যাত্রী পরিষেবা উন্নতিসাধন তথা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত হারে যাত্রীভাড়া বাড়ানো যেতেই পারে এবং যাত্রীভাড়া বাড়ানোর পক্ষে এটাই আদর্শ সময় ছিল। কারণ সংবাদমাধ্যমে যে ছবি প্রতিফলিত হয়েছে তা থেকে এটা পরিষ্কার যে, যাত্রী পরিষেবার উন্নতিসাধনে রেলের যে যে পরিকল্পনা রয়েছে তার কয়েকটি বাস্তবায়িত হলেও বাড়তি ভাড়া গুনতে যাত্রীরা দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু এই সুযোগও হাতছাড়া করা হল। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের অবশিষ্ট সময়ে বার্ষিক ১০ শতাংশ হারে ভাড়া বৃদ্ধি মাশুল কাঠামোর অসংগতি অনেকটাই সংশোধন করতে পারে। এই কাজ এখনও করা সম্ভব।

গত বছরের বাজেটে একটি রেল নিয়ামক কর্তৃপক্ষ (রেল রেগুলেটরি অথরিটি) গঠনের যে নীতিগত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তা এখনও চালু করা যায়নি। অথচ এই নিয়ামক কর্তৃপক্ষ গঠিত হলে মাশুল কাঠামোকে যুক্তিসংগত করার কাজে গতি আসবে। এবার আর দেরি না করে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই নিয়ামক কর্তৃপক্ষ গঠন করা দরকার।

সমাজের বঞ্চিত অংশকে প্রদত্ত সমস্ত রকমের ভরতুকির পর্যালোচনা করে শুধুমাত্র যাদের প্রয়োজন সেই শ্রেণিকে সহায়তা দেওয়ার যে পদক্ষেপ বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে একদিক থেকে তা প্রশংসনীয়। শহরাঞ্চলে একমাত্র স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদেরই ভাড়ায় ভরতুকি প্রয়োজন। বাকিদের ভাড়াবাবদ যে টাকা খরচ হয় তা তারা কোনও না কোনওভাবে নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে ফেরত পেয়ে যান। আর গ্রামাঞ্চলে যাদের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাদের অধিকাংশই চারগুণ বেশি ভাড়া দিয়েও সড়কপথেই যাতায়াত করতে পছন্দ করেন। কারণ গ্রামে তারা নিয়মিত রেলের পরিষেবা পান না। তাই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে সড়কপথই তাদের ভরসা। শিক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ট্রেনে যাতায়াত করতে হয় তারা এমনিতেই ভাড়ায় ছাড় পায়।

রেলের অপারেটিং রেশিও (প্রতি একশো টাকা আয় করতে রেলকে যত টাকা ব্যয় করতে হয়) যেভাবে বাড়ছে তাও রীতিমতো চিন্তার কারণ। ২০১৪-১৫ সালে রেলের অপারেটিং রেশিও যেখানে ছিল ৮৮.২ শতাংশ সেখানে ২০১৫-১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ শতাংশে। পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৬-১৭ সালে এই অনুপাত গিয়ে দাঁড়াবে ৯২ শতাংশে। এ মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে সহায়সম্পদ সৃষ্টি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন যে কতখানি তা এই হিসাব থেকেই স্পষ্ট। রেলে আর্থিক ফলাফলের ক্রমাবনতির নেপথ্যে অনেক কারণ রয়েছে একথা হয় তো ঠিক। কিন্তু এটা ভেবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনায় দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে রেলে যে বর্ধিত অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তা যাতে উৎপাদনশীল হয়। বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার সময় দেখতে হবে কোনওমতেই যেন সময় ও অর্থের অপচয় না হয়। নজরদারি ব্যবস্থাপনাকে আরও জোরদার করতে হবে এবং সম্ভাবনাময় মূলধনি বাজেটের (ক্যাপিটাল বাজেট) সফল রূপায়ণ ঘটাতে গেলে চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাজেটবহির্ভূত সহায়সম্পদ সংগ্রহ বা রেলের হাতে থাকা জমি ব্যবহার করে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি এবার খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে সস্তার হোটেল (বাজেট হোটেল) গড়ে আয়ের একটা বিকল্প পথ তৈরি করে রাখা যেতে পারে। কিন্তু গত দেড় দশক ধরে বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় টানাপোড়েন চলেছে। এবার সর্বোচ্চস্তরে অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো প্রয়োজন। হোটেলের জন্য জমি চিহ্নিত হয়ে গেছে। এবার একক জানালা ব্যবস্থার মাধ্যমে আতিথেয়তা শিল্পমহলের বড় বড় সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি কর্পোরেট সংস্থাকে চিহ্নিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই IRCTC-র নাম প্রথমে আসবে। কারণ এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা IRCTC-এর রয়েছে। তবে যে সংস্থাকেই বাছাই করা হোক না কেন, পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

অনুরূপভাবে রেল স্টেশনগুলির আধুনিকীকরণের কাজও আয়ের একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। এক্ষেত্রেও বহু কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি সমন্বয়কারী সংস্থাকে বাছাই করে অবিলম্বে এই কাজের দায়িত্ব আউটসোর্স করে দিতে হবে।❑

[লেখক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিসে যোগ দেন ১৯৬৩ সালে। ভারতীয় রেলে ৩৮ বছর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব সামলে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ রেল সংস্কার প্রকল্পে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা।]

প্র। চ্ছ। দ। নি। ব। ন্ধ

নারী সশক্তিকরণ ও জেন্ডার বাজেট

প্রেক্ষাপট কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৬-১৭

নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেরই অন্যতম দায়িত্ব। আবার এ কথাও অনস্বীকার্য যে, লিঙ্গবৈষম্য দূর করে নারীদের অবস্থানে উন্নতি না আনতে পারলে, এ দেশে সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। নারী সশক্তিকরণের আলোকে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জেন্ডার বাজেটের মূল্যায়ন করে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন **ড. উদয়ভানু ভট্টাচার্য্য।**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভারত সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে পক্ষে ও বিপক্ষে নানা মতামত প্রকাশিত হচ্ছে। কেউ কেউ এই বাজেটকে 'গ্রামমুখী বাজেট' আখ্যা দিয়েছেন। কারও বা মতে এই বাজেটে উন্নয়নের দিশা নেই, বাজেট পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিকে তাকিয়ে করা হয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য উপযুক্ত কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মধ্যবিত্ত বেতনভোগী মানুষদের এই বাজেট অত্যন্ত হতাশ করেছে, এমন আলোচনাও শোনা যাচ্ছে। আবার অনেকেই অভিযোগ করেছেন এই বাজেটে মহিলাদের জন্য বিশেষ কিছুই সংস্থান রাখা হয়নি, বরং আগের বেশকিছু প্রকল্প যা মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল তাদের অবহেলা করা হয়েছে। মোটের ওপর বলা চলে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ তাদের শ্রেণিগত অবস্থান থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন যার অধিকাংশই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশিত। সমগ্র বাজেটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়েও একথা কিন্তু বলা চলে যে, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলিতে বাজেট সংস্থান যে খুব বেশি বাড়ানো হয়নি, বরং ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে বাজেট-বরাদ্দ কমে গিয়েছে, তা তথ্যগতভাবে সত্য।

তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, কেন মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করে সেখানে বাজেট বরাদ্দ করা হবে? পুরুষদের জন্য পৃথক কোনও প্রকল্প তো নেই বা থাকলেও হাতে গোনা। এতে কি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারের বিষয়টি লঙ্ঘিত হচ্ছে না! এককথায় এর উত্তর না, হচ্ছে না। কারণ সমগ্র বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশে ও সমাজে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের প্রসঙ্গে অসাম্য খুবই প্রকট। পুরুষদের চাইতে নারীরা পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, জীবিকায়, গার্হস্থ্যে অর্থাৎ বলা চলে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে বহুলাংশে পিছিয়ে আছে। বর্তমান পৃথিবীতে নারী ও পুরুষের সত্যিকারের সমানাধিকার বাস্তবে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা সকল রাষ্ট্রের এক অন্যতম সর্বজনস্বীকৃত দায়িত্ব।

কেবলমাত্র মহিলাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি/অসরকারি/বেসরকারি ক্ষেত্রের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান বিশ্বের বহু দেশেই কার্যকরী এক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এর পোশাকি নাম জেন্ডার বাজেট। এই বাজেট হল এমন এক বাজেট যেখানে সমাজে মহিলাদের জীবনচক্র জুড়ে (জন্ম থেকে আমৃত্যু) চলা বৈষম্যকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তুত এমন এক বাজেট যার উদ্দেশ্য হল সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের অসাম্য দূর করতে নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন নীতি, কার্যক্রম ও প্রকল্প প্রণয়ন ও তার রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

জেন্ডার বাজেট এই বিশ্বাস থেকে প্রণয়ন করা হয় যে, নারীকেন্দ্রিক প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে নারীদের যদি উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া হয়, তাঁদের যদি যথার্থভাবে আত্মনির্ভর করে তোলা যায় তবে বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীসমাজ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে পুরুষের সঙ্গে একযোগে, একতালে দেশের সার্বিক উন্নয়নে শামিল হবে। দেশের প্রায় অর্ধেক জনসমষ্টি যদি জীবনের সবক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকে, যদি শৈশবকাল থেকে সমাজে এই ভাবনার মধ্যে বেড়ে ওঠে যে, আমি নারী, তাই পুরুষরা যা পারে, যা তাদের মানায় তার অধিকার আমার নেই, তবে সেই দেশের ও সমাজের উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব তা বুদ্ধির অগোচর।

জেন্ডার বাজেটের আলোচনায় প্রথমেই বলা ভালো যে, এই বাজেট প্রণয়ন ও রূপায়ণ করতে গিয়ে সমগ্র বাজেটকে অর্ধেক পুরুষকেন্দ্রিক প্রকল্প ও অর্ধেক নারী উন্নয়ন স্বার্থে গৃহীত প্রকল্প এই ৫০-৫০ ভাগ করা হয় না। বাজেটে এমন বহু প্রকল্প ও কর্মপরিকল্পনা থাকতেই পারে যেখানে ১০০ শতাংশ অর্থ নারী উন্নয়ন ও সশক্তিকরণের জন্য খরচ করা হতে পারে। আবার জেন্ডার বাজেট সরকারি বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই বাজেট নীতি অসরকারি, বেসরকারি মুনাফাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করে থাকে। তবে বাজেট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ অর্থ যেন নারী উন্নয়নের স্বার্থে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বণ্টিত হয়।

ভারতে জেন্ডার বাজেট

১৯৮৪ সালে অস্ট্রেলীয় সরকার প্রথম জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও রূপায়ণ করে। পরবর্তী বছরগুলিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ধারাবাহিকভাবে জেন্ডার বাজেটের পক্ষে সওয়াল শুরু করে এবং দেখা যায় যে, গত শতাব্দীর নয়ের দশকে বিশ্বের বহু দেশেই

জেন্ডার বাজেটকে স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রচনা করে। ভারতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে এমন কিছু কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা কেবলমাত্র মহিলাদের কথা মাথায় রেখেই প্রণীত হয়। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের হাতে এমন ২৭টি কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের ভার দেওয়া হয়েছিল যার উপভোক্তা কেবলমাত্র মহিলারা। অষ্টম ও তৎপরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও রূপায়ণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রক ২০০৪-০৫ সাল থেকে যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা সারণি-১-এ দেখানো হয়েছে।

২০০৫-০৬ সালের বাজেট বক্তৃতায় (অনুচ্ছেদ-২৫) তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর থেকে প্রাপ্ত ১০টি জেন্ডার বাজেট সংক্রান্ত চাহিদা অনুযায়ী উক্ত খাতে অনুমিত বাজেট বরাদ্দ ১৪,৩৭৯ কোটি টাকা রাখা হচ্ছে। সারণি-২-তে দেখানো হয়েছে যে, ২০০৫-০৬ পরবর্তী দশ বছরে জেন্ডার বাজেটের অনুমিত ও সংশোধিত বাজেট। ২০০৬-০৭ সাল থেকে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তর থেকে প্রাপ্ত জেন্ডার বাজেটের চাহিদাকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগ অর্থাৎ পার্ট-এ অংশে এমন প্রকল্পগুলি রাখা হয়েছে যার পুরো অর্থ অর্থাৎ ১০০ শতাংশ বাজেট বরাদ্দ মহিলা উন্নয়নের খাতে ব্যয় হবে, বা বলা চলে যে, উক্ত প্রকল্পগুলির উপভোক্তা হবেন কেবল দেশের মহিলারা (যেমন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অন্তর্গত প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা)। অন্য ভাগে, অর্থাৎ পার্ট-বি-তে অন্তর্গত প্রকল্পগুলির ব্যয়বরাদ্দ কমপক্ষে ৩০ শতাংশ মহিলাদের জন্য ব্যয় করা হবে। দুই ক্ষেত্রেই অর্থবরাদ্দ দুভাগে বিভক্ত—পরিকল্পনাখাত এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূতখাত। এই নীতি অনুসরণ করে পরবর্তী বছরগুলিতে জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ অর্থ যেমন বেড়েছে, তেমনি ভারত সরকারের বহু মন্ত্রক ও দপ্তরে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি-২-তে এ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য সংকলিত হয়েছে।

সারণি-১
ভারতে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও রূপায়ণে পদক্ষেপ

বছর	গৃহীত পদক্ষেপ
২০০৪-০৫	ভারত সরকারের প্রতিটি মন্ত্রক ও দপ্তরে 'জেন্ডার বাজেট সেল' গঠন বাধ্যতামূলক করা এবং মন্ত্রক ও দপ্তরের বাজেট প্রস্তুতিতে জেন্ডার অভিমুখকে জোরদার করা।
২০০৫-০৬	এই প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে পৃথকভাবে 'জেন্ডার বাজেট বিবরণী' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
২০০৭	৮ মার্চ তারিখে অর্থমন্ত্রক জেন্ডার বাজেট সেলের জন্য এক সনদ প্রস্তুত করে যেখানে উক্ত সেলগুলির গঠন ও কার্যাবলি পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন আজ কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; দেশের অনেক রাজ্য এমনকী কেরালায় স্থানীয় সরকারগুলি তাদের নিজস্ব বাজেটে এই জেন্ডার বাজেটকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য। তবে এ কথা ঠিক যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের এক বিরাট অংশ (বিশেষত, পরিকল্পনাখাতে ব্যয়বরাদ্দ) রূপায়িত হয়ে থাকে রাজ্য তথা স্থানীয় সরকারগুলির মাধ্যমে। তাই কেন্দ্রীয় বাজেটে, জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ অর্থ প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে কম-বেশি সকল রাজ্যই পেয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কোনও রাজ্য সরকার পৃথকভাবে জেন্ডার বাজেট রূপায়ণ করলে সেই রাজ্যের তো বটেই সার্বিকভাবে দেশের অন্য অংশের মহিলাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে পারে যা পরিণামে দেশের মানবসম্পদ ও অর্থনীতিকে মজবুত করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের জেন্ডার বাজেট ও তার মুল্যায়ন

২০১৬-১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারা যায় :

সারণি-২
কেন্দ্রীয় বাজেটে জেন্ডার বাজেটের অংশভাগ

বছর	শতকরা ভাগ (%)
২০০৫	২.৭৯
২০০৬	৫.০৯
২০০৭	৪.৫০
২০০৮	৩.৬৮
২০০৯	৫.৫৭
২০১০	৬.১১
২০১১	৬.২২
২০১২	৫.৯১
২০১৩	৫.৮৩
২০১৪	৫.৪৬
২০১৫	৪.৪৬

সূত্র : Rukmini, S., "Budget 2015-16 in eight charts", *The Hindu* (১ মার্চ, ২০১৫)

প্রথমত, জেন্ডার বাজেটের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট বাজেট ব্যয়ের ৪.৫৫ শতাংশ (অর্থাৎ সরকারের সমগ্র ব্যয় যদি ১০০ টাকা ধরা হয় তবে ৪.৫৫ টাকা জেন্ডার বাজেটের জন্য খরচ হয়েছে) খরচ করা হয়েছে। অথচ ওই অর্থবর্ষে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৪.৫৮ শতাংশ। উক্ত অর্থবর্ষে দেখা গেছে যে, নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রকের ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ তার ঠিক পূর্বের বছরের অর্ধেক। কিন্তু বাস্তবে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে, এই মন্ত্রকে মোট খরচের পরিমাণ প্রায় ১৭,৩৫২ কোটি টাকা যা বাজেট বরাদ্দের থেকে অনেক বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ১৭,৪০৮ কোটি টাকা। দেশের মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে এই ব্যয়বরাদ্দ কিন্তু আগের বছরের তুলনায় কমই। সুতরাং বলা চলে যে, নারী উন্নয়নের প্রশ্নে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি বরং কমতির দিকেই তার গতি।

দ্বিতীয়ত, এ বছরের বাজেটে 'জাতীয় মহিলা সশক্তিকরণ প্রকল্পে' গত বছরের

তুলনায় দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৫০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। অন্যদিকে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ৪.৫ শতাংশ জেন্ডার বাজেটের খাতে অনুমিত হয়েছে যা এক সময় ৬.২২ শতাংশ ছিল (২০১১-১২ অর্থবর্ষের বাজেটে)। এছাড়াও জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে গত বছরের তুলনায় বর্তমান বছরের বাজেটে মন্ত্রকের সংখ্যা কমে গেছে (৩৪ থেকে কমে ৩১ হয়েছে)। স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রকের সংখ্যা কমলে, চাহিদার সংখ্যাও কমবে। তার ফলে জেন্ডার বাজেটের ওপর প্রত্যক্ষ বিরূপ প্রভাব পড়তে বাধ্য।

তৃতীয়ত, এ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী পাচার প্রতিরোধ এবং কিশোরীদের সশক্তিকরণের জন্য গৃহীত প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা যে হিংসার মুখোমুখি হয় তা নিবারণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কোনও ব্যয়বরাদ্দ করা হয়নি। এমনকী গার্হস্থ্য হিংসা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য কোনও বরাদ্দ রাখা হয়নি। অন্যদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ছাঁটাই করে পরোক্ষভাবে মহিলাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। যেমন ICDS প্রকল্পে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ব্যয়বরাদ্দ ছিল মাত্র ৮০০০ কোটি টাকা যদিও ওই সময়ে প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ১৫,৩৯৪ কোটি টাকা। এ বছর ব্যয়বরাদ্দ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪,০০০ কোটি টাকা। দেশের মুদ্রাস্ফীতির বর্তমান হারের সাপেক্ষে বলা চলে যে এ বছরের প্রকৃত ব্যয়বরাদ্দ ১৪,০০০ কোটির কম। এছাড়া ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনাতেও ব্যয়বরাদ্দ গত বছরের তুলনায় বাড়েনি।

চতুর্থত, এ বছরের বাজেটে দেশের ১.২ কোটি দরিদ্র মহিলাদের রান্নার গ্যাস (LPG) সংযোগের জন্য ২০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি ভালো উদ্যোগ কারণ গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের রন্ধনের জন্য গাছের ডালপালার ওপর নির্ভর করতে হয়। গ্যাস সংযোগের ফলে বনাঞ্চল নিধনের ওপর লাগাম পরানো যেতে পারে এবং গ্যাস ব্যবহার পরিবেশবান্ধবও বটে। তবে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্টই কম এবং প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, দালাল চক্রের হাতে পড়ে এই উদ্যোগ যেন মাঠে মারা না যায়।

পরিশেষে, বলা যেতে পারে যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কিছু গৃহীত সিদ্ধান্ত নারী উন্নয়নের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, গত বছর MGNREGA প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ কাটছাঁট করে কেবলমাত্র IPPE ব্লকে উক্ত প্রকল্পে অর্থবরাদ্দ করা হচ্ছে। এর ফলে সারা দেশে সার্বিকভাবে প্রকল্পটি রূপায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা দেখা যাচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার IPPE ব্লকগুলি ব্যতীত অন্য কোনও ব্লকে MGNREGA প্রকল্পে অর্থ জোগান দেবে না। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ৩৪১ ব্লকের মধ্যে মাত্র ১২৪টি IPPE ব্লক হিসেবে চিহ্নিত। এখন MGNREGA আইনে পরিষ্কার বলা আছে যে কোনও অর্থবর্ষে মোট শ্রমদিবসের অন্তত ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। বলাই বাহুল্য, IPPE ব্লকের বাইরে ব্লকের মহিলাদের MGNREGA প্রকল্প থেকে কাজের কোনও উপায়ই থাকল না, যার ফলে সরাসরি পরিবারের আয় কমে গেল। মহিলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরূপ নীতিগত সিদ্ধান্ত বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য সন্দেহ নেই। তবে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বাজেটে MGNREGA প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৩৯৫০০ টাকা করা হয়েছে এবং ২০১৫ সাল থেকে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে ৫০-৫০ শতাংশ হারে কর্মবণ্টন হতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উপসংহার

জেন্ডার বাজেট উপযোগী ও কার্যকরী করে তুলতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন হল প্রচুর পরিমাণে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলির যথোপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ, যাতে করে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা যায়। উপযুক্ত তথ্য প্রয়োজন বাজেট প্রস্তুতির বিভিন্ন ধাপে; যেমন, প্রাথমিক পর্যায়ে তথ্য থাকা দরকার নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকাদের মধ্যে বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য প্রয়োজন জেন্ডার বাজেটের মাধ্যমে কোনও প্রকল্পে অর্থ সংস্থান হলে তাতে কত শতাংশ মহিলা, কিশোরী ও বালিকা উপকৃত হবে তা নির্ণয় করা। এছাড়া প্রকল্পটি রূপায়িত হলে মহিলারা/বালিকারা ঠিক কতটা উপকৃত হয়েছেন, পূর্বের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার মানের কতটা উন্নতি ঘটেছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক তথ্য তথা ইমপ্যাক্ট অ্যানালিসিসের প্রয়োজন। তবেই জেন্ডার বাজেট তার উদ্দেশ্য পূরণে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

শেষকথা এই যে, আমাদের দেশের সরকার জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যদি নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে গুরুত্ব আরোপ করে বাজেট বরাদ্দ করে, তবে তা সার্বিকভাবে দেশের মহিলাদের উন্নয়নে সবিশেষ সহায়ক হবে—

(ক) নিরাপত্তামূলক সেবাতে আরও বেশি বরাদ্দ করা প্রয়োজন। নারী পাচার রুখতে, মহিলা ও শিশুদের ২৪ × ৭ × ৩৬৫—এইভাবে নিরাপত্তামূলক আশ্রয় প্রদানের ক্ষেত্রে, গৃহহীন মহিলাদের জন্য রাত্রিবাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(খ) সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে আরও বেশি জোর দেওয়া দরকার। যেমন, জননী সুরক্ষা যোজনা, ক্রেশ নির্মাণ, খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যোজনা, কিশোরী শক্তি যোজনা প্রভৃতি।

(গ) মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সেগুলির একদিকে যেমন পুনর্মূল্যায়ন দরকার, তেমনি একই সঙ্গে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া প্রয়োজন যা মহিলাদের একদিকে যেমন সশক্তিকরণে সহায়ক হবে, অন্যদিকে তেমনি তাদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর করে তুলবে।❑

[লেখক বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যাচর্চা বিভাগের অধ্যাপক। হায়দরাবাদের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পঞ্চায়েতিরাজ'-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
email : uday.rdmku@gmail.com]

রেল বাজেট ২০১৬-১৭

প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে ভারতীয় রেল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। জাতীয় অর্থনীতিতেও রেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্যই রেল বাজেট ঘিরে সাধারণ মানুষ থেকে শিল্পমহল, সকলেরই আগ্রহ থাকে বিপুল। এই যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার আগামী অর্থবর্ষের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করছেন **অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।**

যাত্রীভাড়া কি বাড়বে? পণ্য মাশুল কি হবে? নতুন কোনও ট্রেন চালু হবে কি? নতুন কোনও প্রকল্প ঘোষণা হবে? যাত্রীদের জন্য নতুন সুবিধা বা ছাড় দেবে কি না? এরকমই কত না প্রত্যাশা থাকে রেল বাজেট সংসদে পেশ হওয়ার আগে। মানুষের রেলের বিষয়ে এত আগ্রহ হওয়ার কারণ হচ্ছে রেলের কাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও দেশের অর্থনীতিতে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিল্প-বাণিজ্যমহল, রাজনৈতিক দল, ছোট-বড় ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ সবাই নজর রাখেন রেল বাজেট প্রস্তাবের দিকে।

বাজেট প্রস্তাব তৈরির সময় লক্ষ্য রাখতে হয় অনেক বিষয়ে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, উন্নয়নের হার, আন্তর্জাতিক বাজারে খনিজ তেলের দামের ওঠাপড়া, দেশের বিশেষ কোনও এলাকা বা শিল্পের উন্নয়নের চিন্তা তার মধ্যে কয়েকটি। একই সঙ্গে রেলের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা, আর্থিক সংগতি অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্দেশ করা, কারিগরি উন্নয়নের সঙ্গে তাল মেলানো, সামাজিক চাহিদা পূরণ ইত্যাদিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে রেলের কাছে সাধারণ যাত্রীদের চাহিদা হল সময়মতো ট্রেন চলাচল যাতে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি না হয়, রেলযাত্রার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, দূরপাল্লার ট্রেনে খাদ্য-পানীয়ের গুণমান নিশ্চিত করা ও ন্যূনতম কিছু স্বাচ্ছন্দ্য।

বাজেট প্রস্তাবের মাধ্যমে একদিকে দেশের মানুষের প্রত্যাশা ও প্রয়োজন আর অন্যদিকে নিজের সামর্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে রেল। কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন। এ যেন টানটান করে বাঁধা দড়ির উপরে হাঁটা। একটু বেসামাল হলেই পতন অনিবার্য। পুরস্কার হিসাবে নিন্দা ও সমালোচনার ঝড়।

বাজেট প্রস্তাবে আয় বাড়ানোর নতুন উপায়ের সন্ধান করার পাশাপাশি ব্যয় যাতে না বাড়ে সেই চেষ্টাও করতে হয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ রেল বাজেট প্রস্তাব পেশ হল ২০১৬-১৭ সালের জন্য। মোট ১ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকার মূলধনী যোজনা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। রাজনৈতিক ঝোঁক বর্জিত এই প্রস্তাবে কোনও জনমোহিনী চটকদারি নেই। রয়েছে বাস্তব অবস্থার নির্মোহ বিশ্লেষণ ও সেই অনুযায়ী আগামী দিনের কাজের পরিকল্পনা। যাত্রী ও পণ্য উভয় ক্ষেত্রেই ২০১৫-১৬ সালের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। তার ফলে মোট আয়ও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের কথা মনে রেখে যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল বাড়ানো হয়নি।

বরং রেল ভ্রমণের গুণমান বাড়াতে যুগোপযোগী যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আগামী দু বছরের মধ্যে ৪০০টি স্টেশনে ওয়াই-ফাই সুবিধা, পরিবেশ অনুকূল শৌচালয়, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আরও বেশি লোয়ার বার্থের কোটা, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটার সুবিধা, শিশুখাদ্যের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। নতুন চারটি সুপারফাস্ট ট্রেন চালু করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যাত্রী সাধারণের সিংহভাগ হলেন নিত্যযাত্রী যাঁরা দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন লোকাল ট্রেন পরিষেবার উপরে। মুম্বইয়ের নিত্যযাত্রীদের জন্য এলিভেটেড করিডোরের প্রস্তাব রয়েছে। রেল সফরের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে পারলে বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থার চেয়ে রেলই বেশি পছন্দ করেন সাধারণ মানুষ। এই পথে চলে রেলের যাত্রী সংখ্যা বাড়াতে পারলে যাত্রী পরিবহণখাতে রেলের আয়ও বাড়ানো যাবে। নতুন যে চারটি ট্রেন পরিষেবা চালু করা হবে সেগুলি হল অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস, হামসফর, তেজস ও উদয়। তাছাড়া অসংরক্ষিত আসনের যাত্রীদের কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য চালু করা হবে 'দীনদয়ালু' কামরা।

টিকিট কাটা, আসন সংরক্ষণ করা ও প্রয়োজনে টিকিট বাতিল করার পদ্ধতি আরও সহজ করার জন্য চালু হচ্ছে 'হ্যান্ড হেল্ড টার্মিনাল' ও মোবাইল অ্যাপ। কামরা ও শৌচাগারে পরিচ্ছন্নতার দাবি জানাতে মোবাইলে এসএমএস-এর সুযোগ নিতে পারবেন যাত্রীরা। টিকিট কাটার জন্য দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার অসুবিধা দূর করতে টিকিট ভেন্ডিং মেশিন আগেই এসে গেছে। এখন প্ল্যাটফর্ম টিকিটও এই মেশিনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। নগদ অর্থের পাশাপাশি ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে যাতে টিকিট কাটা যায় তার

জন্য মেশিনগুলিকে উপযুক্ত করে তোলা হবে।

আগামী তিন মাসের মধ্যে এমন ই-টিকেটিং ব্যবস্থা চালু করা হবে যাতে বিদেশি পর্যটক এবং অনাবাসী ভারতীয়রা বিদেশি ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের সাহায্যে টিকিট কাটতে পারবেন।

সংরক্ষিত টিকিট বাতিল করার জন্য আর আসন সংরক্ষণ অফিসের কাউন্টারে যাওয়ার দরকার হবে না। ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমে ফোনের সাহায্যেই টিকিট বাতিল করা যাবে।

বার কোডেড টিকিট ও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বিনা টিকিটে যাত্রা বন্ধ করে প্রকৃত যাত্রীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হবে। তৎকাল টিকিটের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বন্ধ করতে কাউন্টারে সিসিটিভির নজরদারি চালানো হবে। পরিকল্পনা রয়েছে কোনও সংস্থাকে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পিআরএস ওয়েবসাইটের অডিট করানোর।

২০১৫ সালে চালু করা 'বিকল্প' ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে। তার ফলে আরও বেশি ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা নির্দিষ্ট ট্রেনে আসন বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।

স্বচ্ছ ভারত গড়ার লক্ষ্যে রেলে স্বচ্ছতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সারা দেশজুড়ে 'ক্লিন মাই কোচ' পরিষেবার অধীনে যাত্রী একটি এসএমএস পাঠিয়ে তাঁর কামরায় শৌচাগারে পরিচ্ছন্নতার অনুরোধ জানাতে পারবেন। রেলে সংগৃহীত বর্জ্য সাফাই করার জন্য পাঁচটি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হবে আগামী অর্থবর্ষে। জনসচেতনতা বাড়াতে প্রচারের উদ্যোগও নেওয়া হবে। ৩০,০০০ বায়ো-টয়লেট বসানো ছাড়াও বাছাই করা কিছু স্টেশনে সব প্ল্যাটফর্মে প্রবীণ নাগরিক, মহিলা ও দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বহনযোগ্য বায়ো-টয়লেট-এর ব্যবস্থা রাখা হবে। এগুলির জোগান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব, বিজ্ঞাপনের অধিকার, সামাজিক সংস্থাদের স্বেচ্ছা যোগদান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

গ্রাহক সন্তুষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল খাদ্য-পানীয় সরবরাহ। ভালো মানের খাবার জোগান দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কেটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন খাদ্য প্রস্তুত করা ও খাদ্য বণ্টন এই দুটি বিষয়কে পৃথকভাবে পরিচালনা করবে। ই-কেটারিং ব্যবস্থা পঁয়তাল্লিশটি স্টেশনের থেকে সম্প্রসারিত করে 'এ-১' এবং 'এ' শ্রেণিভুক্ত চারশো আটটি স্টেশন থেকে করা হবে। ট্রেনে বাধ্যতামূলক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঐচ্ছিক করা যায় কি না ভেবে দেখা হবে। স্থানীয় রন্ধন প্রণালীতে প্রস্তুত খাদ্য যাত্রীরা তাঁদের পছন্দমতো যাতে বেছে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হবে। টাটকা ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য ট্রেনে জোগান দেওয়ার জন্য IRCTC-এর পরিচালনায় আরও দশটি আধুনিক 'বেস কিচেন' স্থাপন করা হবে। খাবারের গুণমান নিশ্চিত করতে বাইরের সংস্থাকে দিয়ে 'অডিট' করা হবে। একটি নতুন নীতি গ্রহণ করা হবে যাতে স্টেশনের স্টলগুলি থেকে নির্দিষ্ট একটি দ্রব্যের বদলে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করা যায়। তাহলে একই স্টল থেকে দুগ্ধজাত খাদ্য পানীয় এবং 'ওভার দি কাউন্টার' ওষুধের মতো জিনিসও যাত্রীরা পাবেন।

ভারতীয় রেলে দীর্ঘদিন ধরেই 'অপারেশনাল হল্ট' ও 'কমার্শিয়াল হল্ট'-এর পার্থক্য রয়েছে। সব 'অপারেশনাল হল্ট'-কে 'কমার্শিয়াল হল্ট'-এ পরিবর্তন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এই বছরের বাজেটে। কিছু কিছু ট্রেনের 'অপারেশনাল হল্ট'-এ যাত্রীরা ওঠানামা করতে পারতেন না। সেই অসুবিধা দূর করা যাবে এই প্রস্তাব রূপায়িত হলে। কোঙ্কণ রেলে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে 'সারথি সেবা', বৃদ্ধ ও অসমর্থ যাত্রীদের স্টেশনে বিভিন্ন সাহায্যের জন্য। এই সুবিধা অন্যান্য স্টেশনেও সম্প্রসারিত করা হবে। এর মাধ্যমে যাত্রীরা ব্যাটারিচালিত গাড়ি, পোর্টার সেবা ইত্যাদি পাবেন মূল্যের বিনিময়ে। বর্তমানের 'পিকআপ অ্যান্ড ড্রপ' এবং হুইল চেয়ার পরিষেবা থাকছে। রেল ভ্রমণের সময় যাত্রীদের জন্য ঐচ্ছিক ভিত্তিতে ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

রিটায়ারিং রুম বুকিং-এর ক্ষেত্রে একটি পরবির্তন প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানের ন্যূনতম ১২ ঘণ্টার বুকিং-এর বদলে প্রস্তাব করা হয়েছে ঘণ্টাভিত্তিক বুকিং-এর। এতে যাত্রীরা কোনও স্টেশনে পৌঁছে দিনের কাজে রওনা দেওয়ার আগে প্রাতঃকৃত্য স্নান ইত্যাদি করে নিতে পারবেন। এবং এই ব্যবস্থাটি পেশাদারি দক্ষতায় পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে রিটায়ারিং রুমগুলিকে IRCTC-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রীদের রুচি ও প্রয়োজন বদলে যাচ্ছে। যাত্রীদের কাছে রেলকে আরও আকর্ষণীয় এবং উপযোগী করে তুলতে রেলের কামরার নকশা ও বিন্যাস নতুন করে ভাবা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কামরায় যাত্রী বহন ক্ষমতা বাড়বে অন্যদিকে তেমনই আরামদায়ক আসন, নান্দনিক রুচিসম্পন্ন পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, বিনোদনের উপায়, ভেন্ডিং মেশিন ইত্যাদি অনেক সুবিধাও দেওয়া যাবে যাত্রীদের।

বর্তমানে টিকেটিং-এর জন্য, অসন্তোষ জানানোর জন্য ইত্যাদির পৃথক পৃথক ডিজিটাল সমাধান রয়েছে। রেল চাইছে এই সব সুবিধাকে দুটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সুসংহত করতে। একটি হবে টিকেটিং সম্বন্ধে সবরকম প্রয়োজনের জন্য আর অন্যটি হবে যাবতীয় অসন্তোষ, অভিযোগ ও পরামর্শ জানানোর জন্য।

ভারতীয় রেল সর্বদা গ্রাহকের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল থাকার লক্ষ্যে যত্নশীল। সেই লক্ষ্যে রেল বন্দোবস্ত করছে যাতে দক্ষতা বাড়ে সেই প্রথম সারির কর্মীদের যাঁরা সরাসরি গ্রাহকদের মুখোমুখি হন এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে রেলের কাজ করেন। রেলের কার্যক্ষেত্রে তাঁদের সহজে চিনে নেওয়ার জন্য তাঁদের ইউনিফর্মের নকশা ঢেলে সাজানো হবে।

কামরায় কী কী সুবিধা বা পরিষেবা পাওয়া যাবে তার তালিকা দেওয়া থাকবে কামরার ভিতরে। জিপিএস সক্ষম ডিজিটাল ডিসপ্লেতে যাত্রীরা পাবেন সামনে যেখানে গাড়ি থামবে তার প্রকৃত সময়ভিত্তিক তথ্য। রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই নেটওয়ার্কে থাকবে ২০০০টি স্টেশনের ২০,০০০টি স্ক্রিন। এটি পরিচালিতও হবে উন্নত কারিগরি ব্যবস্থার সাহায্যে। এর মাধ্যমে প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে

তথ্য পৌঁছে দেওয়া যাবে যাত্রীদের কাছে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবেও এটির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

সমস্ত 'এ-১' শ্রেণির স্টেশনগুলির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন স্টেশন ডিরেক্টর। এঁদের থাকবে উপযুক্ত ক্ষমতা আর সহায়তার জন্য থাকবেন বিভিন্ন বিভাগের দক্ষ কর্মীরা। এঁরা স্টেশনটিকে একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে পরিচালনা করবেন। ট্রেনেও সমস্ত সুবিধার জন্য একজন ব্যক্তি দায়ী থাকবেন।

ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে কত না তীর্থক্ষেত্র। ভারতীয় যাত্রীদের কাছে তীর্থযাত্রার আকর্ষণ তীব্র। রেলযাত্রীদের একটা বিরাট অংশই তীর্থযাত্রার প্রয়োজনে রেলের সওয়ার হন। তীর্থস্থানের স্টেশনগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত ও সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে আজমের, অমৃতসর, বিহার শরিফ, দ্বারকা, চেঙ্গানুর, গয়া, হরিদ্বার, মথুরা, নাগপট্টিনাম, নান্দেদ, নাসিক, পালি, পরসনাথ, পুরী, তিরুপতি, বারাণসী ইত্যাদি স্টেশন। পরিকল্পনা রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তীর্থক্ষেত্রগুলিকে যুক্ত করে 'আস্থা' সার্কিট ট্রেন চালানোর।

আমেদাবাদ ও মুম্বইয়ের মধ্যে হাই স্পিড প্যাসেঞ্জার করিডোর তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। প্রকল্পটিতে জাপান সরকার সহায়তা করছে। হাই স্পিড প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা স্থাপনের কাজ শুরু হচ্ছে। দ্রুতগতির ট্রেন চালানো ছাড়াও এই প্রকল্পটির অবদান হবে ভারতীয় রেলের কারিগরি অগ্রগতি এবং নতুন উৎপাদন ক্ষমতা। এর সুফল রেল তার বর্তমান পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবে।

শহরতলির লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের জন্যও বাজেটে প্রস্তাব রয়েছে। মুম্বই দেশের আর্থিক রাজধানী। এখানে দরকার একটি মজবুত ও ক্ষমতাসম্পন্ন শহরতলির পরিবহণ ব্যবস্থা। এখানকার লোকাল ট্রেন পরিষেবা এখন ক্ষমতার অতিরিক্ত চাপ বহন করছে। এই চাপ কমাতে দুটি এলিভেটেড সুবার্বন করিডোর নির্মাণের প্রকল্প শুরু করছে রেল। একটি করিডোর হবে ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাল মুম্বই থেকে পানভেল পর্যন্ত আর অন্যটি চার্চগেট থেকে ভিরার পর্যন্ত। সিএসটিএম-পানভেল করিডোরটি যুক্ত হবে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাধীন মেট্রো রেলের সঙ্গে যেটি ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।

কলকাতায় বিভিন্ন মেট্রো প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার লাইন তৈরি হচ্ছে। সব প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে যাত্রীবহন ক্ষমতা বর্তমানের তুলনায় চারগুণ বেড়ে যাবে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের রূপায়ণের বাধাগুলি দূর করা সম্ভব হয়েছে এবং এর প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যাবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকল্পটি আরও ৫ কিলোমিটার সম্প্রসারণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে।

দেশের রাজধানী দিল্লির পরিবেশ দূষণের থেকে নিস্তার পেতে রিং রেলওয়ে পুনরুজ্জীবিত করার কথা ভাবা হয়েছে। এটির পরিকাঠামো নতুন করে গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে হাত মেলাবে রেল। দেশের বিভিন্ন শহরে শহরতলির ট্রেন পরিষেবা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করছে রেল। তবে এই জন্য বিনিয়োগের নতুন কাঠামো তৈরি হওয়া দরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে। আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং চেন্নাইতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অভিনব বিনিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে রেল এই কাজের অংশীদার হতে পারে। একইভাবে কেরলের রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় তিরুবনন্তপুরমের জন্যও ভাবা যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং রেলের বর্তমান সংগতির কথা মনে রেখে এক নতুন পথের দিশা খুঁজতে চাওয়া হয়েছে বাজেট প্রস্তাবে।

পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরেই অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যমের তুলনায় রেল পিছিয়ে পড়ছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু রেলের উপরেই নয়, দেশের সমগ্র অর্থনীতির উপরেও পড়ছে। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং তার জন্য তিনটি ক্ষেত্রে নতুন কিছু করতে হবে। সেগুলি হল ভারতীয় রেলের পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, মাশুল কাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও টার্মিনাল ক্ষমতার বৃদ্ধি।

রেলের পরিবাহিত পণ্যের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগ হল দশটি পণ্য যেগুলি বিপুল পরিমাণে রেল বহন করে। আয় বাড়াতে হলে এছাড়া অন্য পণ্যের দিকেও নজর দিতে হবে। বাজারের চরিত্র অনুযায়ী পরিকাঠামো উন্নয়ন করে এবং কাজের ধরন বদল করে এমন উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আরও বেশি পণ্য রেলে পরিবহণের জন্য আনা যায়। এছাড়া বর্তমানে মালগাড়ি চালানোর কোনও নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। কিন্তু যাঁরা পণ্য রেলে পাঠাবেন তাঁরা চাইবেন পণ্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেন গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সেই চাহিদা মনে রেখে রেল এ বছরই নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী কন্টেনার, পার্সেল ও বিশেষ পণ্যের জন্য মালগাড়ি চালাতে শুরু করবে। এখন বিভিন্ন কারণে কন্টেনারে মাল পাঠানো পছন্দ করছেন গ্রাহকরা।

সেই চাহিদা অনুযায়ী কয়লা ও নির্দিষ্ট কিছু আকরিক ছাড়া বাকি সব রকমের পণ্যের জন্য কন্টেনার পরিবহণের ব্যবস্থা করছে রেল। এমনকী চাহিদা কম থাকলে আংশিক বোঝাই করা কন্টেনারও বহন করবে রেল। যত জায়গায় সম্ভব, সেই সব টার্মিনাল বা ছাউনিতে কন্টেনার নেওয়ার বন্দোবস্তও করছে রেল। রেলের পণ্য মাশুল নীতিও নতুন করে ভাবতে হবে যাতে গ্রাহকদের কাছে অন্য পরিবহণ ব্যবস্থার তুলনায় রেল পরিবহণ খরচ সাশ্রয়কারী হয় এবং ব্যবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক হয়। নিয়মিত ও বেশি পণ্য রেলে পরিবহণ করতে চান এমন গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে মাশুল ধার্য করা যেতে পারে। পণ্য গুদামে রাখার ও পরিবহণ সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধার অভাবের জন্য সম্ভাব্য গ্রাহক রেলে পণ্য পাঠাতে চান না। একটি সম্পূর্ণ পণ্য পরিবহণ সুবিধা যাতে গ্রাহকদের দেওয়া যায় তার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে রেল সাইড লজিস্টিক পার্ক ও গুদামের ব্যবস্থা গড়ে তোলার। এগুলি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে।

ফলে প্রয়োজনীয় পেশাদারি দক্ষতা ও বিনিয়োগের জোগান সহজ হবে। অন্যদিকে অনেক গ্রাহক রেলে পণ্য পরিবহণে আগ্রহী হবেন।

এছাড়া ট্রান্সপোর্ট লজিস্টিকস কোম্পানি অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় পরিবহণ পরিষেবাদাতা হিসাবে রেলের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এই কোম্পানির উদ্যোগে অন্তত দশটি গুডস শেড স্থাপিত হবে। গাড়ি পরিবহণের বাজার ধরতে চেন্নাইতে একটি রেল অটো হাব চালু হতে চলেছে শীঘ্রই। রেল সাইড গুদাম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড স্টোরেজের সুবিধার প্রয়োজন দেখা দেবে ফ্রেট টার্মিনালের কাছাকাছি এলাকায়। স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। আগামী তিন মাসের মধ্যেই এই বিষয়ে নীতি স্থির করা হবে। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রধান গ্রাহকরা যাতে একটিমাত্র স্থানে যোগাযোগ করে রেল সংক্রান্ত যাবতীয় সমাধান পান তার জন্য কি-কাস্টমার ম্যানেজার নিয়োগ করা হবে। এর ফলে গ্রাহকদের প্রয়োজন মেটাতে ও অভাব অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করতে হবে না। কি-কাস্টমার ম্যানেজারই তাঁর তরফে সব কাজ সামলাবেন। এতে রেল পরিবহণ ব্যবহারে জটিলতার কারণে গ্রাহকদের অনীহা কাটিয়ে ওঠা যাবে।

প্রথাগত শুল্ক ও মাশুলবাবদ আয় ছাড়াও রেলের আয় বাড়ানোর জন্য বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করা হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরেই। কারণ ভারতীয় রেলের হাতে এমন অনেক সম্পদ রয়েছে যার সঠিক বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবন করতে পারলে আয় বাড়তে পারে উল্লেখযোগ্যভাবে। বাজেট প্রস্তাবে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার ছাপ রয়েছে। স্টেশন ভবনগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে খালি জমি ও স্টেশন ভবনের উপরে খালি জায়গার সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। রেল লাইনের দু পাশে বিস্তীর্ণ খালি জমি উদ্যানপালন ও বনসৃজনের জন্য ইজারা দিলে রেলের আয় হবে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, পরিবেশেরও উন্নতি হবে এবং রেলের জমি জবর দখলের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এখানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও করা যায়। রেলের ডিজিটাল পরিষেবাক্ষেত্রগুলির বাণিজ্যিক উপযোগিতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বাড়ানো সম্ভব। স্টেশনে, ট্রেনের কামরার ভিতরে ও বাইরে, বড় স্টেশনগুলির বাইরে সংলগ্ন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থার মাধ্যমে, কর্মীদের পোশাকে বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতীক বা লোগো ব্যবহার করতে দেওয়ার মাধ্যমে ইত্যাদি অনেক উপায়ে বিজ্ঞাপনিখাতে রেলের আয় বাড়ানো যায়। আগামী তিন মাসে ২০টি স্টেশনে এই বিষয়ে সমীক্ষা চালানো হবে। পার্সেল, ক্যুরিয়ার ও এক্সপ্রেস ব্যবসার বাজারে রেলের উপযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে রেলের পার্সেল বহনের নীতির রদবদল ঘটিয়ে আরও উদার করা হচ্ছে। এই পরিষেবায় দরজা-থেকে-দরজা-পর্যন্ত পৌঁছানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে রেলের উপযোগিতা বাড়ানোর জন্য। এখানে দ্রুত বেড়ে ওঠা ই-কমার্স ব্যবস্থাকে আকৃষ্ট করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। পার্সেল বুকিং অনলাইন ব্যবস্থায় করার জন্য একটি পাইলট প্রোজেক্ট চালু করা হবে।

রেলের নিজস্ব উৎপাদন কারখানা ও মেরামত কারখানা রয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং উন্নত উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করা সম্ভব। এই অতিরিক্ত ক্ষমতা সদ্ব্যবহার করে দেশের ভিতরের ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আয় করা যেতে পারে। তার জন্য অবশ্য এই কারখানাগুলিকে উপযুক্ত ক্ষমতা ও উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

রেলের কাজে পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করলে খরচ কমানো সম্ভব এবং প্রকল্পের রূপায়ণে বিলম্ব এড়ানো যায়। এই উদ্দেশ্যে ইপিসি (ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিওরমেন্ট, কনস্ট্রাকশন)-ভিত্তিক ঠিকাদারি প্রথা চালু করছে রেল। অন্তত ২০টি প্রকল্পে এই প্রথায় কাজ হবে ২০১৬-১৭ সালে। ২০১৭-১৮ সালে যাতে ৩০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের সব কাজ ইপিসিভিত্তিক ঠিকাদারি ব্যবস্থায় করা যায় সেই উদ্যোগ নিচ্ছে রেল। আশা করা হচ্ছে যে, এতে প্রকল্পের ব্যয় কমবে ও দ্রুত রূপায়ণ সম্ভব হবে।

কয়েকটি পরিকাঠামোগত রদবদলের ঘোষণা করা হয় এবারের রেল বাজেটে। এগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল রেল বোর্ডের পরিকাঠামো সংস্কার। বিভাগীয় প্রবণতা, বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে সহযোগিতার অভাব এবং ব্যবসায়িক লক্ষ্যের অভাবের সংশোধন করাই এই সংস্কারের উদ্দেশ্য। রেলকে আরও বাস্তবানুগ সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে গেলে প্রয়োজন সংগঠনের সব বিভাগের সংগঠনের মূল লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে কাজ করা। এই উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ধাঁচে রেল বোর্ডের সংস্কার করতে চাওয়া

নতুন চার ট্রেন পরিষেবা

অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস : দূরপাল্লার সুপারফাস্ট ট্রেন। কোনও সংরক্ষিত আসন নেই। ‘আম আদমি’ যাত্রীদের দ্রুতগতির পরিষেবা দেওয়াই লক্ষ্য।

তেজস : সুপারফাস্ট ট্রেন। গতিবেগ ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটার বা তার বেশি। বিনোদন ও ওয়াই-ফাই সুবিধা থাকবে যাত্রীদের জন্য। ভবিষ্যতে রেল পরিষেবা কীরকম হতে চলেছে তার ইঙ্গিত হবে এই ট্রেন।

হামসফর : সুপারফাস্ট। বাতানুকূল থ্রি টিয়ার আসন পুরো ট্রেনে। চাইলে খাবার পাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

উদয় : ডবল ডেকার ট্রেন। চালানো হবে যাত্রীসংখ্যা বেশি এমন রুটগুলিতে এবং শুধু রাত্রে। অন্তত ৪০ শতাংশ বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন।

দীনদয়ালু কামরা : অসংরক্ষিত কামরা। থাকবে পানীয় জলের বন্দোবস্ত ও অনেক বেশি সংখ্যায় মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট। বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনে দুই থেকে চারটি ‘দীনদয়ালু’ কামরা যুক্ত করার পরিকল্পনা।

হয়েছে। রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের হাতে উপযুক্ত ক্ষমতা থাকবে যাতে তিনি কার্যকর নেতৃত্ব দিতে পারেন। প্রথম ধাপে রেল বোর্ডের মধ্যে বিভিন্ন কার্যধারার সমন্বয় করার জন্য কয়েকটি ডিরেক্টরেট তৈরি করা হবে। এঁদের কাজ হবে যাত্রী ভাড়া ও পণ্য মাশুল ছাড়া অন্যান্য উপার্জন, গতিবৃদ্ধি, মোটিভ পাওয়ার ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়গুলি তদারকি করা পিপিপি বিভাগকেও আরও শক্তিশালী করা হবে যাতে ভারতীয় রেলের সঙ্গে ব্যবসা করা সহজ হয়। সংস্কারের এই পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে 'নবীনীকরণ'।

আরেকটি সংস্কার পর্বের নাম 'সশক্তিকরণ'। বর্তমান পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য রাখা তহবিল সর্বোচ্চ দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে বিনিয়োগ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে রেল স্থাপন করতে চাইছে রেলওয়ে প্ল্যানিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অর্গানাইজেশন যাঁদের কাজ হবে ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং তার ভিত্তিতে প্রকল্প চিহ্নিত করা যাতে রেলের সাংগঠনিক লক্ষ্য পূর্ণ হয়। এঁরা স্বাধীনভাবে বাজারের তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী বিস্তারিত প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে সাহায্য করবেন। পাশাপাশি উদ্ভাবনী আর্থিক সংস্থান বিষয়ে পরামর্শ দেবেন।

রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রালয় এবং অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ন্যাশনাল রেল প্ল্যান তৈরি করা হবে যাতে দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক-এর উন্নয়নের পরিকল্পনা করা যায়। রেল নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধন করে সারা দেশজুড়ে সুসংহত পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ হবে। পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় সুড়ঙ্গ ও বড় সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে রেল ও সড়ক পথ যদি একসঙ্গে তৈরি করা যায় তবে ব্যয় সাশ্রয় হবে।

'ঐকীকরণ' নামে আরেকটি সংস্কার পরিকল্পনায় রেলের অধীনের সব কোম্পানিগুলিকে সংহত করে একটি হোল্ডিং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। এর ফলে এই কোম্পানিগুলির সম্পদ ও দক্ষতা ব্যবহারে নমনীয়তা আসবে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

আসন সংরক্ষণ : সমস্ত সংরক্ষিত কামরায় ৩৩ শতাংশ আসন বরাদ্দ থাকবে মহিলাদের জন্য। মাঝের বার্থটি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হেল্প লাইন : কোনও অভিযোগ জানাতে ফোন করতে হবে ১৮২ নম্বরে। হেল্প লাইনটি চালু থাকবে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা।

জননী সেবা : শিশু সন্তান নিয়ে যাত্রা করছেন এমন মা-দের সুবিধার জন্য গরম জল, বেবি ফুড ও দুধ পাওয়া যাবে স্টেশনে আর ট্রেনেও। বাচ্চাদের পছন্দসই খাদ্যের জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও দেখা হবে। বাচ্চাদের পোশাক পরিবর্তন করার সুবিধার জন্য শৌচাগারে রাখা হবে 'চেঞ্জিং বোর্ড'।

সিসি টিভি : উদ্দেশ্য মহিলাদের সুরক্ষার দিকে নজর রাখা। ৩১১টি স্টেশনে পর্যায়ক্রমে।

গ্রাহকদের উৎকৃষ্ট মানের পরিষেবা দেওয়ার জন্য ভারতীয় রেলের সর্বাধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তির প্রয়োজন। রেলের অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি হল উচ্চগতির ট্রেন, পণ্যবাহী ট্রেনের ভারবহন ক্ষমতা বাড়ানো, রোলিং স্টক অর্থাৎ লোকোমোটিভ, কামরা, ওয়াগন ইত্যাদি এবং সিগন্যালিং। এখানে উন্নতির জন্য পৃথিবীর সেরা প্রযুক্তি চাই। স্বল্পমেয়াদি ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি সেরা রেলওয়ের সহযোগিতায় এইসব ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে এই প্রয়াসকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফরেন রেল টেকনোলজি কো-অপারেশন স্কিম রচনার কাজ চলছে।

একটি পৃথক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যার নাম হবে স্পেশাল রেলওয়ে এসটাব্লিশমেন্ট ফর স্ট্র্যাটেজিক টেকনোলজি অ্যান্ড হলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট। আরডিএসও এখন থেকে দেখবে দৈনন্দিন বিষয়গুলি আর নতুন সংস্থাটি কাজ করবে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার বিষয়গুলি নিয়ে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় রেল বছরে ১০০ টেরাবাইটের বেশি তথ্য সংগ্রহ করলেও তার খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় না বললেই হয়। স্পেশাল ইউনিট ফর ট্রান্সপোর্টেশন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকস নামে একটি সংস্থা এই তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করবে। এতে বিনিয়োগ ও পরিচালন সম্পর্কে উচিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য হবে।

'নব রচনা' শীর্ষক একটি প্রস্তাবে ৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল রাখা হচ্ছে। এখান থেকে রেলের কর্মচারী, স্টার্টআপ এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নব উদ্ভাবনার কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করা হবে। রেলের কোনও কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজতে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে। এছাড়াও রেলের উৎপাদন কারখানা ও মেরামতি কারখানায় ইনোভেশন ল্যাব স্থাপন করা হবে যেখানে রেলকর্মী এবং স্থানীয় মানুষ তাঁদের উদ্ভাবনী চিন্তার প্রয়োগ করতে পারবেন।

রেলের গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে সাহায্যের জন্য একটি টেস্ট ট্র্যাক তৈরি করা হবে। কোনও উদ্ভাবিত নমুনার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কার্যকারিতা ও দক্ষতা পরীক্ষা করার কাজে এটি ব্যবহার হবে। এতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্রুত হবে। রেলের লাইনে পরীক্ষা করতে গেলে সময় লাগে বেশি, কৃত্রিমভাবে সবরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায় না এবং ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। রেলের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজে এই টেস্ট ট্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অবতরণ—সাতটি মিশন

ভারতীয় রেলকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে, রেলের আয় বাড়াতে, বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক রূপায়ণ ইত্যাদি লক্ষ্যে বাজেটে সাতটি মিশন ঘোষণা করা হয়েছে।

(১) মিশন ২৫ টন : আয় বাড়াতে হলে বহন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সেই জন্য

পরিকাঠামোর ক্ষমতা বাড়িয়ে ২৫ টন এক্সেল লোড নেওয়ার উপযুক্ত করতে হবে। ২৫ টন এক্সেল লোড ক্ষমতার ওয়াগনে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পণ্য পরিবহণ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৭০ শতাংশ পণ্য উচ্চ বহন ক্ষমতার মালগাড়িতে নেওয়ার কথা।

(২) **মিশন জিরো অ্যাক্সিডেন্ট :** রেলে যত দুর্ঘটনা ঘটে তার ৪০ শতাংশ হয় লেভেল ক্রসিং-এ আর মোট প্রাণহানির ৬৮ শতাংশও ঘটে এখানেই। এই ক্রসিং-এর কারণে ট্রেনের গতিবেগও কমে যায়। রেল আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে আর কোনও প্রহরীহীন লেভেল ক্রসিং রাখতে চায় না। তার জন্য অর্থ জোগানের উপায় নির্ণয় করা হবে।

একই সঙ্গে ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে স্বদেশি প্রযুক্তি 'ট্রেন কলিশন অ্যাভয়ডেন্স সিস্টেম' চালু করা হবে। এতে ট্রেনের গতি বাড়ানো সম্ভব হবে। আগামী ৩ বছরের মধ্যে সব ব্যস্ত রুটগুলিতে এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে।

(৩) **মিশন পেস :** রেলের জন্য উপকরণ ও পরিষেবা সংগ্রহের কাজে চালু করা হবে 'প্রোকিওরমেন্ট অ্যান্ড কনসাম্পশন এফিসিয়েন্সি' বা সংক্ষেপে 'পেস'। এর ফলে খরচ বাঁচানো ছাড়াও সংগৃহীত উপকরণ ও পরিষেবার গুণমানও উন্নত করা যাবে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় হবে আশা করা হচ্ছে।

(৪) **মিশন রফতার :** এটি হবে মিশন ২৫-এর পরিপূরক। এর লক্ষ্য হল পণ্যবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ দ্বিগুণ করা ও যাত্রীবাহী সুপার ফাস্ট মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের গড় গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার বৃদ্ধি করা। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এটি রূপায়ণ করা হবে।

ব্যাঘ্র দর্শন

জাতীয় পশু বাঘ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্যাকেজ ট্যুর। ট্রেনে যাত্রা, জঙ্গল ভ্রমণ ও থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত। কানহা, পেঞ্চ আর বান্ধবগড়ের জঙ্গলে।

(৫) **মিশন হান্ড্রেড :** রেলে পরিবাহিত পণ্যের ৮৫ শতাংশ আসে বেসরকারি মালিকানাধীন সাইডিং ও ফ্রেট টার্মিনাল থেকে। এরকম সাইডিং বা টার্মিনাল স্থাপনের ৪০০-এরও বেশি প্রস্তাব বিভিন্ন স্তরে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রস্তাব অনুমোদনের প্রক্রিয়াটিকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করা হবে। নীতিগত সংস্কারও করা হবে যাতে বেসরকারি প্রস্তাব উৎসাহ পায়। আগামী ২ বছরে অন্তত ১০০টি সাইডিং স্থাপন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

(৬) **মিশন রিয়ন্ড বুক কিপিং :** ভারতীয় রেলে প্রচলিত হিসাব রক্ষণ পদ্ধতিতে প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করা যায় না। যদিও হিসাব রক্ষার পদ্ধতি বদল করা হচ্ছে কিন্তু দরকার এমন উপায় যাতে প্রতিটি 'আউট কাম'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'ইনপুট'-এর হিসাব পাওয়া যায়। এটি একটি কাঠামোগত পরিবর্তন যার ফলে প্রতিটি এককের উৎপাদন ব্যয় জানা যাবে। এতে সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংস্কারটি রূপায়িত হবে।

(৭) **মিশন ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন :** দুটি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর ২০১৯ সালের মধ্যে চালু হওয়ার কথা। তখন দিল্লি-মুম্বই ও দিল্লি-কলকাতা রুটে পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান পথ থেকে পণ্যবাহী ট্রেনগুলি ফ্রেট করিডোরে সরিয়ে দিলে এই ব্যস্ত রুটগুলির উপরে চাপ কমে যাবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এই জনপ্রিয় রুট দুটিতে যাত্রী পরিষেবা বৃদ্ধি করা যাবে। এই লক্ষ্যে পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রাখতে হবে যাতে বহন ক্ষমতা উদ্বৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সদ্ব্যবহার করা যায়।

রেল বাজেট পেশ করার সময় সামাজিক দায়িত্ব, কর্মী কল্যাণ, তরুণ প্রজন্মের জন্য হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বনির্ভরগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ বৃদ্ধি, পরিবেশ, অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ে রেলের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রেল কর্মীদের নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতারও প্রশংসা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালের রেল বাজেটে বিভিন্ন খাতে রেলের মোট আয় ধরা হয়েছে আনুমানিক ১,৮৪,৮২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে যাত্রী পরিবহণ থেকে ৫১,০১২ কোটি টাকা ও পণ্য পরিবহণ থেকে ১,১৭,৯৩৩ কোটি টাকা আয় হবে। বাকি অর্থ পাওয়া যাবে কোচিং এবং অন্যান্য বিবিধ খাতে।

বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যমহল থেকে ২০১৬-১৭ সালের রেল বাজেটকে আধুনিক ও বাস্তবোচিত বলা হয়েছে। কোনও চটকদার ঘোষণা বর্জন করাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খরচ না বাড়িয়ে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। অপারেটিং রেশিও ৯২ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। কঠিন হলেও সাফল্যলাভ অসম্ভব নয় এমনটাই মনে করছেন অনেকে।❑

[লেখক পূর্ব রেলের প্রবীণ জনসংযোগ আধিকারিক ছিলেন।]

ভারতের কৃষি এবং কৃষক-দরদি কেন্দ্রীয় বাজেট

ভারতীয় অর্থনীতি আজও কৃষিপ্রধান। আগের তুলনায় জাতীয় আয়ে এই ক্ষেত্রের অবদান বহুলাংশে কমলেও, কর্মসংস্থানের নিরিখে কৃষিক্ষেত্র শীর্ষ স্থানই বজায় রেখেছে। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উপর এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট কী প্রভাব ফেলবে, বিস্তারিত আলোচনা করছেন **ড. সগর মৈত্র।**

ভারতে এখন প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাই ভারতের উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রামের মানুষের প্রধান পেশা হল কৃষি। কৃষি মানে কেবলমাত্র ধান-গম-ভুট্টা প্রভৃতি মাঠ-ফসল ও সবজি চাষ নয়, কৃষির সহযোগী সমস্ত বিষয়কেই ব্যাপক অর্থে কৃষিকর্ম বোঝায়। দেশের ৪৯ শতাংশ শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। উন্নত অর্থনীতির দেশে কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার অনেক কম। মনে রাখা দরকার, ভারতে কৃষিজমির পরিমাণ ১৫৯ মিলিয়ন হেক্টর অর্থাৎ বিশ্বের ১১.৩ শতাংশ কৃষিজমি রয়েছে আমাদের দেশে। আর পৃথিবীর ১৭ শতাংশ মানুষের বাস ভারতে। জনসমষ্টির ক্ষুধা মেটানোর জন্য আমাদের কৃষিকে আরও দক্ষ করে তুলতে হবে। এদিকে কৃষির ওপরে গ্রামীণ মানুষের নির্ভরশীলতা প্রায় একই রকম রয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্মে যুক্ত আছেন, তাঁরা পারিবারিকভাবে কিন্তু একই পেশায় রয়ে গিয়েছেন, যদিও খামারের (জোতের) আয়তন জনসংখ্যা বাড়ার কারণে ক্রমশ কমেছে। ২০০৭-১২ সাল পর্যন্ত ভারতে কৃষির বৃদ্ধি ঘটে ৩.৭ শতাংশ হারে। সেখানে ২০১২-১৭ সালের মধ্যে কৃষি বিকাশের হার ৪ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে। এই সব তথ্যের অবতারণা করা হল এই কারণে যে, আমাদের দেশের কৃষির চালিকাশক্তি ছোট ও প্রান্তিক কৃষকেরা এবং তাঁরা বিভিন্নভাবে সমস্যাগ্রস্ত, আর তাঁদের ওপরেই আসলে বর্তায় কৃষি-বিকাশের গুরুদায়িত্ব।

চিত্র-১
কৃষিতে জিডিপি-র শতকরা হার (২০০৪-০৫ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে)

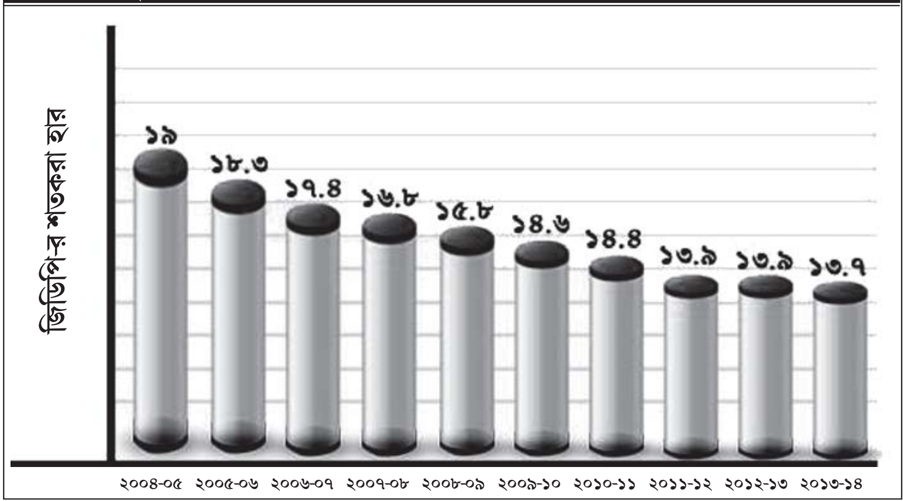

বর্তমান কৃষিচিত্র

২০১৩-১৪ সালে দেখা যায়, ভারতে জাতীয় আয়ের (জিডিপি) প্রায় ১৩.৯ শতাংশ কৃষির অবদান (২০০৪-০৫ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে), ২০০৪-০৫ সালে তা ছিল ১৯ শতাংশ, ১৯৯০ সালে যা ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। প্রায় এক দশক সময়ে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ৫ শতাংশের কাছাকাছি কমলেও তা কিন্তু খারাপ জায়গায় নেই। কারণ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশে যেমন অস্ট্রেলিয়ায় কৃষিক্ষেত্র থেকে জাতীয় আয়ের মাত্র ৫ শতাংশ আসে, মাত্র ৩ শতাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ২ শতাংশ যুক্তরাজ্যে। এই সব তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আমাদের অর্থনীতির বিকাশকে ধরে রাখতে গেলে কৃষি অর্থনীতিকে মজবুত করতে হবে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, দেশের গড় জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান কিন্তু ক্রমশ কমছে (চিত্র-১)। এটি চিন্তার বিষয়। সে-কারণে দেশের কৃষি পরিকল্পনা রচনা হওয়া উচিত সুস্থায়ী বিকাশের (sustainable development) কথা মাথায় রেখে।

উন্নয়নশীল দেশ ভারত আজও কৃষিপ্রধান। দেশের অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে পরিকাঠামো, শিল্প, শক্তি ও পরিষেবার উন্নতি ঘটানো দরকার। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসমষ্টির খাদ্যচাহিদা মেটানো মোটেই সহজ কাজ নয়, যেখানে বার্ষিক

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশ। তাছাড়া দরকার কৃষিপণ্য রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, যা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পথকে সুগম করবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০৪-০৫ সালে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যেখানে ১৯৮.৩৬ মিলিয়ন টন ছিল, সেখানে ২০১৩-১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৫.০৪ মিলিয়ন টনে, যা পরের বছর বিরূপ আবহাওয়ায় কমে যায় (সারণি-১)। এই এক দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সেচসেবিত জমির পরিমাণ ৪৪.২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ শতাংশের মতো। এখানে বলা দরকার, সেচসেবিত এলাকায় নিশ্চিত জলের জোগানের জন্য ফলন ভালো হয়। অন্যদিকে, বৃষ্টিসেবিত এলাকায় অতিবৃষ্টি বা বৃষ্টিহীনতার কারণে ফলন মার খায়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তারতম্য বা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার ওপরে আমাদের দেশের কৃষি আজও নির্ভরশীল।

প্রসঙ্গত, তণ্ডুল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাফল্য দেখা গেলেও ডালশস্যের উৎপাদন কিন্তু তেমন একটা বাড়েনি। বিগত দশকে প্রায় মাত্র ৫ মিলিয়ন টন উৎপাদন বেড়েছে ডালশস্যের (সারণি-২)। ডালশস্য কেবলমাত্র মানুষেরই পুষ্টিচাহিদা মেটায় না, প্রাণীখাদ্য তৈরির একটি উপাদান হল ডালশস্য ও তার উপজাত। সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ডাল উৎপাদক দেশ ভারত (বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২৪ শতাংশ আমাদের দেশে উৎপাদিত হয়), তবু চাহিদার তুলনায় এই উৎপাদন কম। কারণ প্রধানত বৃষ্টিসেবিত এলাকায় ডালশস্য চাষ করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির দেখা মেলে না। একই অবস্থা তৈলবীজেরও। সেখানেও দেখা যায়, এক দশকে নয়টি প্রধান তৈলবীজের উৎপাদন কিন্তু তেমন একটা বাড়েনি (সারণি-৩)। আবার ২০১৪-১৫ সালে প্রতিকূল আবহাওয়ায় তৈলবীজের

সারণি-১
ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদন চিত্র (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৪-১৫)

বর্ষ	এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	ফলন (কেজি প্রতি হেক্টর)
২০০৪-০৫	১২০.০৮	১৯৮.৩৬	১৬৫২
২০০৫-০৬	১২১.৬০	২০৮.৬০	১৭১৫
২০০৬-০৭	১২৩.৭১	২১৭.২৮	১৭৫৬
২০০৭-০৮	১২৪.০৭	২৩০.৭৮	১৮৬০
২০০৮-০৯	১২২.৮৩	২৩৪.৪৭	১৯০৯
২০০৯-১০	১২১.৩৩	২১৮.১১	১৭৯৮
২০১০-১১	১২৬.৬৭	২৪৪.৪৯	১৯৩০
২০১১-১২	১২৪.৭৫	২৫৯.২৯	২০৭৮
২০১২-১৩	১২০.৭৮	২৫৭.১৩	২১২৯
২০১৩-১৪	১২৬.০৪	২৬৫.০৪	২১০১
২০১৪-১৫	—	২৫২.০২	—

সূত্র : Agricultural Statistics at a glance 2014 (www.agricoop.nic.in এবং dac.nic.in)

সারণি-২
ভারতে ডালশস্য উৎপাদন চিত্র (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫)

বর্ষ	এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	ফলন (কেজি প্রতি হেক্টর)
২০০৫-০৬	২২.৩৯	১৩.৩৮	৫৯৮
২০০৬-০৭	২৩.১৯	১৪.২০	৬১২
২০০৭-০৮	২৩.৬৩	১৪.৭৬	৬২৫
২০০৮-০৯	২২.০৯	১৪.৫৭	৬৫৯
২০০৯-১০	২৩.২৮	১৪.৬৬	৬৩০
২০১০-১১	২৬.৪০	১৮.২৪	৬৯১
২০১১-১২	২৪.৪৬	১৭.০৯	৬৯৯
২০১২-১৩	২৩.২৬	১৮.৩৪	৭৮৯
২০১৩-১৪	২৫.২৩	১৯.২৭	৭৬৪
২০১৪-১৫	—	১৭.১৫	—

সূত্র : Agricultural Statistics at a glance 2014 (www.agricoop.nic.in এবং dac.nic.in)

উৎপাদন মার খায়। চাষের এলাকা, উৎপাদন ও মূল্যের বিচারে খাদ্যশস্যের পরেই তৈলবীজের অবস্থান। এখানেও দেখা যায় প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ তৈলবীজ উৎপাদিত হয় বৃষ্টিসেবিত এলাকায়। মানুষ এবং প্রাণীর পুষ্টির জন্য আবশ্যিক ফ্যাট ও ফ্যাটি অ্যাসিডের উৎস হল তৈলবীজ। তেল নিষ্কাশনের পরে যে খইল বা অন্যান্য উপজাত রয়ে যায়, তা প্রাণীখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে তৈলবীজের উৎপাদন কম। তাই ভারত বিশ্বের দরবারে ডালশস্য ও তৈলবীজের অন্যতম আমদানিকারী দেশ হিসাবেই পরিচিত রয়ে গেল।

তন্তু ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। ২০০৩-০৪ সালে দেশে তুলোর উৎপাদন ছিল ১৩৭.২৯ লাখ বেল (১ বেল = ১৮০ কেজি)। ২০১৩-১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫৯ লাখ বেলে। এই সময় তুলো চাষে একটি

পরিবর্তন আসে। দেশি উন্নত জাত ও সাধারণ হাইব্রিডের জায়গা দখল করে 'বিটি-কটন'। কিন্তু ২০১৪-১৫ সালে উৎপাদিত হয় ৩৪৮ লাখ বেল তুলো। খরাক্লিষ্ট ২০১৫-১৬ সালে অনুমান করা হয় যে এই উৎপাদন নেমে আসবে প্রায় ৩০৭ লাখ বেলে। পাট ও সহযোগী তন্তুর উৎপাদন প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে উৎপাদন দাঁড়ায় ১১১.২৬ লাখ বেল (১ বেল = ১৮০ কেজি)। আখ উৎপাদনে ব্রাজিলের পরেই ভারতের অবস্থান। আমাদের দেশে ৩২৬ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদিত হয়।

উদ্যান পালনের ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে বলা যেতে পারে ফল, সবজি ও ফুল উৎপাদনের কথা। এগুলির উৎপাদন বিগত এক দশকে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ফল উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। আমাদের দেশে প্রায় ৭২১৬ হাজার হেক্টরে ফল চাষ করা হয়, যার সামগ্রিক উৎপাদন ৮৯০ লাখ টন। সবজি উৎপাদনে ভারতের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়, চীনের ঠিক পরেই। প্রায় ৯৫ লাখ হেক্টর জমিতে এ দেশে সবজি চাষের বিস্তার, উৎপাদন ১৬২৯ লাখ টন। এ দেশে ফুল চাষের মোট এলাকা ২৫৫ হাজার হেক্টর। কাটা ফুলের উৎপাদন ৫৪২ হাজার টন, সেখানে ঝুরো ফুলের উৎপাদন অনেকটা বেশি, প্রায় ১৭৫৪ হাজার টনের মতো। জাতীয় উদ্যান মিশন কার্যকরী হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে ফুল, ফল, সবজি চাষে বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, হাইটেক পলিহাউস, প্রাকৃতিকভাবে বায়ু-চলাচলযুক্ত পলিহাউস, শেডনেট হাউস ইত্যাদি পরিকাঠামোর মধ্যে সুরক্ষিত চাষের বিস্তার ঘটছে। ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সালে ৪৯ হেক্টর জমিতে হাইটেক পলিহাউস গড়ে ওঠে। ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সালে (নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) আরও ১২৪ হেক্টর জমিতে হাইটেক পলিহাউস তৈরি হয়। এদিকে

সারণি-৩
ভারতে নয়টি প্রধান তৈলবীজের উৎপাদন (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫)

বর্ষ	এলাকা (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	ফলন (কেজি প্রতি হেক্টর)
২০০৫-০৬	২৭.৮৬	২৯.৯৮	১০০৪
২০০৬-০৭	২৬.৫১	২৪.২৯	৯১৬
২০০৭-০৮	২৬.৬৯	২৯.৭৬	১১১৫
২০০৮-০৯	২৭.৫৬	২৭.৭২	১০০৬
২০০৯-১০	২৫.৯৬	২৪.৮৮	৯৫৮
২০১০-১১	২৭.২২	৩২.৪৮	১১৯৩
২০১১-১২	২৬.৩১	২৯.৮০	১১৩৩
২০১২-১৩	২৬.৪৮	৩০.৯৪	১১৬৮
২০১৩-১৪	২৮.৫৩	৩২.৭৪	১১৪৮
২০১৪-১৫	—	২৭.৫১	—

সূত্র : Agricultural Statistics at a glance 2014 (www.agricoop.nic.in এবং dac.nic.in)

২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সালে ১৭৮০ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিকভাবে বায়ু-চলাচলযুক্ত পলিহাউস গড়ে ওঠে। এর পরের দুই বছরে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ সালে (নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) আরও ৪০৯০ হেক্টর জমিতে হাইটেক পলিহাউস তৈরি হয়। এই সব উন্নত পরিকাঠামোর ভিতরে চাষের দ্বারা নিশ্চিত ফলন উৎকৃষ্ট গুণমানের ফসল পাওয়া যায়। এই উৎকৃষ্ট পণ্য বিদেশে রপ্তানি করারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। টাটকা ফল ও সবজি, প্রক্রিয়া-করা ফল ও সবজি, ফুল-সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মোট রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ১০ শতাংশ কৃষিপণ্যের দখলে। ফসল নির্বাচনে এবং উৎপন্ন পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে পারলে কৃষিপণ্য রপ্তানির বহর বাড়বে। প্রসঙ্গত, ২০১৪-১৫ সালে ভারত প্রায় ২৯৫৭৯ মেট্রিক টন মধু রপ্তানি করে, যার মূল্য প্রায় ৫৩৫ কোটি টাকা।

কৃষির সহযোগী ও পরিপূরক হল প্রাণীপালন। ভারতে প্রাণীসম্পদের বিকাশ উল্লেখযোগ্য। ২০০৪-০৫ সালে আমাদের দেশে দুধের উৎপাদন ছিল ৯২.৫ মিলিয়ন টন, যা ২০১৩-১৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৭.৭ মিলিয়ন টনে। ডিমের উৎপাদন এই সময়কালের মধ্যে ৪৫.২ বিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩.৪ বিলিয়ন। ২০০৪-০৫ সালে সারা দেশে ৪৪.৬ মিলিয়ন কেজি পশম উৎপাদিত হত, ২০১৩-১৪ সালে পশমের উৎপাদন দাঁড়ায় ৪৭.৯ মিলিয়ন কেজিতে। বিগত এক দশকে মাছের উৎপাদন প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পায়। ২০০৪-০৫ সালে ভারতে মোট ৬৩০৫ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়েছিল। সেখানে ২০১২-১৩ সালে মাছের উৎপাদন এসে দাঁড়ায় ৯০৪০ হাজার টনে।

বৈচিত্রপূর্ণ ও অধিক উৎপাদক এই দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন যে কেবলমাত্র মানুষের ক্ষুধা ও প্রয়োজন মিটিয়েছে, এমনটা নয়। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান রয়েছে। ২০১২-১৩ সালে ২,৩২,০৪১ কোটি টাকার কৃষিপণ্য ভারত থেকে রপ্তানি করা হয়, যা মোট জাতীয় রপ্তানির ১৪.২ শতাংশ। অবশ্য এই বছরে প্রায় ১,০৯,৬১১ কোটি টাকার কৃষিপণ্য আমদানি করা হয় (যা মোট আমদানির মাত্র ৪.১১ শতাংশ)। অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও কৃষির গুরুত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪-১৫ সালে ভারত প্রায় ২৯৫৭৯ মেট্রিক টন মধু রপ্তানি করে, যার মূল্য ৫৩৫ কোটি টাকা।

ভারতে কৃষি জলবায়ুর বৈচিত্র রয়েছে। সেই বৈচিত্র তৈরি করে সম্ভাবনার ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষিতে অনেক সমস্যাও রয়েছে। ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের দ্বারা এ দেশের কৃষি নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন না। এখন আবার বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ভীষণভাবে দেখা যাচ্ছে। এসবের মিশেল আমাদের দেশের কৃষি ও কৃষকের অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে তুলছে।

এখানে তথ্যের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করা হল যে, আমাদের দেশের কৃষকেরা বিশাল জনসমষ্টির কৃষিপণ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছেন বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনেও কৃষি একটা সদর্থক অবদান রেখে চলেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে কৃষি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও রয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষ্যে এবং টেঁকসই কৃষি উৎপাদনকে নিশ্চিত করার তাগিদে এদিকে বিশেষভাবে তাকানো দরকার। তাই বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও ভারতের কৃষি বিশেষ সমীহ দাবি করে।

কৃষি ও কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৬-১৭

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভূমিকায় বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। সারা বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দা চলছে বিগত দুই বছর ধরে। আর আমাদের দেশে পর পর গত দুই বছরে ১৩ শতাংশের মতো বৃষ্টিপাত কম হওয়ার কথা তিনি বলেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশে কৃষির ওপরে বাড়তি চাপ তৈরি হয়। এই জায়গা থেকে সরকারের ওপরে নৈতিক দায়িত্ব বর্তায় কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার। 'Transform India'-র লক্ষ্যে তিনি বাজেট পেশ করেন। বাজেট প্রস্তাবে অর্থনীতির রূপান্তরের লক্ষ্যে নয়টি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যেগুলিকে তিনি 'স্তম্ভ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রথম স্তম্ভটি হল কৃষি। স্বাভাবিকভাবেই বাজেটে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়।

২০১৬-১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের বরাদ্দে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নে এই কারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা যায়। 'খাদ্য নির্ভরতা'র ঊর্ধ্বে গিয়ে অর্থমন্ত্রী 'আয়ের নিরাপত্তা'র সন্ধান করেছেন। কৃষি খাতে বরাদ্দ করেছেন ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকা, যা সর্বকালীন রেকর্ড। এখানে বলা দরকার, কেন্দ্রীয় বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ২০১৫-১৬ সালে ১০.৪ শতাংশ কমে যায়, যা যথাক্রমে ছিল ৩১,৩২২ ও ২৮,০৫০ কোটি টাকা।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে সেচের উন্নতি ঘটাতে হবে। গত বাজেটে (২০১৫-১৬) 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা' প্রকল্পে ৫৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ বছর এই খাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হয়, ৫৭১৭ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের মোট ৪৬ শতাংশ কৃষি জমি সেচসেবিত। এই প্রকল্পের অধীনে আরও ২৮.৫ লাখ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। AIBP-এর অধীনে চলতে থাকা ৮৯টি সেচ প্রকল্পের কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে দেশের ৮০.৬ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় চলে আসবে। এই প্রকল্পে আগামী অর্থবর্ষে দরকার ১৭ হাজার কোটি টাকা এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে ৮৬,৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৩টি প্রকল্পের কাজ ৩১ মার্চ ২০১৭-র মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। নাবার্ডের ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল গড়ে তোলার কথা এই বাজেটে বলা হয়েছে, যেখানে corpus fund দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। তবে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে ২০১৬-১৭ সালে ব্যয় হবে ১২৫১৭ কোটি টাকা, যা পরে জোগান দেওয়া হবে। তাছাড়া ভৌম জল ব্যবস্থাপনার জন্য ৬০০০ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে। MGNREGA প্রকল্পের অধীনে বৃষ্টিসেবিত এলাকায় পাঁচ লাখ পুকুর ও কূপের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয় এবং এই প্রকল্পেই ১০ লাখ কম্পোস্ট পিটের ব্যবস্থা করা হবে।

২০১৫-১৬ সালে কেন্দ্রীয় বাজেটে অনেকগুলি উন্নয়ন কর্মসূচিকে একই ছাতার নীচে নিয়ে এসে 'কৃষোন্নতি যোজনা'-র অবয়ব দেওয়া হয়। এর মধ্যে সয়েল হেল্‌থ কার্ড, ইন্টিগ্রেটেড স্কিম অন অ্যাগ্রিকালচার কো-অপারেশন, এগ্রিকালচার মার্কেটিং, কৃষিশুমারি ও পরিসংখ্যান, উদ্যান পালন, চিরায়ত কৃষি, ন্যাশনাল এগ্রিটেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবারের বাজেটে সয়েল হেল্‌থ কার্ড তৈরির বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার কথা বলা হয়। ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই খাতে ১০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ বছরের বাজেটে ২০১৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১৪ কোটি কৃষি জোতের সয়েল হেল্‌থ কার্ড তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। এছাড়াও আগামী তিন বছরে বিভিন্ন সার উৎপাদনকারী সংস্থার ২০০টি খুচরো বিপণন কেন্দ্র তৈরি করা হবে, যেখানে মাটি ও বীজ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ বছরের বাজেটে শহরের বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা ভারত সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' অনুমোদন করেছে।

দেশের মোট কৃষিজমির ৫৫ শতাংশ বৃষ্টিসেবিত। কেন্দ্রীয় বাজেটে এই এলাকায় জৈব কৃষি প্রসারের কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যে দুটি প্রকল্প চালু হয়েছে। একটি হল 'পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা', যার আওতায় আগামী তিন বছরে পাঁচ লাখ

একর জমিকে তিন বছরে জৈব কৃষিতে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল 'অর্গানিক ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট রিজিয়ন'। যেসব জৈব কৃষিপণ্য উৎপাদিত হবে, তার মূল্যমান বৃদ্ধি করে ঘরোয়া ও বিদেশের বাজারের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে এই প্রকল্পে। এই দুটি খাতে ৪১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ডালশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে সুস্পষ্ট। 'জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন' প্রকল্পে ডালশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং দেশের ৬২২টি জেলাকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

কৃষির উৎপাদন বাড়ানো যেমন দরকার, তেমনি কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণনও গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে 'Unified Agriculture Market Scheme' রচনা করা হয়েছে, যেখানে কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য e-platform থাকবে এবং এটি এ বছর (২০১৬) ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিনে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।

'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র মতো প্রকল্পটি এতদিন অর্থের অভাবে ধুঁকছিল। এবারের বাজেটে এটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই বাজেটে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ হিসাবে ১৯ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়। এর সঙ্গে রাজ্যের ব্যয়বরাদ্দ ধরলে এই খাতে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য 'National Disaster Response Fund'-এর নিয়মাবলি পর্যালোচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কৃষকদের হাতে সময়মতো অর্থের জোগান দেওয়ার জন্য কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে এই অর্থের পরিমাণ ৯ লক্ষ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধ করা যেন কৃষকের কাছে বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়, তার জন্য বাজেটে ১৫ হাজার কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের সংস্থান করা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্য ৫৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দেশের সব কৃষক যাতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP)-এর সুবিধা পান, তার ব্যবস্থা করার কথা বাজেটে বলা হয়েছে এবং বর্তমান বাজেটে তিনটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, যেসব রাজ্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়নি, সেই সব রাজ্যে তা রূপায়ণ করতে উৎসাহিত করা হবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় খাদ্য নিগমের দ্বারা 'অন-লাইন'-এ পণ্য কেনা হবে, যাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। তৃতীয়ত, ডালশস্য কেনায় কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

কৃষির পাশাপাশি সহযোগী কর্মগুলোকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা খামারির পারিবারিক আয় বাড়াতে সাহায্য করবে। ডেয়ারি ব্যবসাকে আরও লাভজনক করার জন্য চারটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল 'পশুধন সঞ্জীবনী', যাতে প্রাণীর স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি থাকবে এবং 'নকুল স্বাস্থ্য পত্র' নামে অ্যানিম্যাল হেল্থ কার্ড চালু করা হবে। দ্বিতীয়টি হল 'উন্নত প্রজনন প্রযুক্তি'। তৃতীয়টি, 'e-Pashudhan Haat'। এই প্রকল্পে প্রজননকারী ও খামারিকে e-market portal-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। আর চতুর্থ প্রকল্পটি হল 'National Genomic Centre for Indigenous Breeds' স্থাপন। এই চারটি প্রকল্পে আগামী কয়েক বছরে ৮৫০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

যথার্থই কৃষক দরদি

অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার সময় কৃষির পরে দ্বিতীয় যে স্তম্ভটির উল্লেখ করেন, তা হল গ্রামোন্নয়ন। ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে তিনি এই খাতে মোট ৮৭,৭৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। কৃষি আর গ্রামোন্নয়ন ভীষণভাবে সম্পর্কিত এবং একে অন্যের পরিপূরক। এই দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, গ্রামোন্নয়নের খাতে যে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়বে দেশে কৃষি অর্থনীতির ওপরে। সব মিলে এবারের বাজেটে সরকারের কৃষক-দরদি মুখ ভেসে ওঠে, যা সময়ের নিরিখে একান্তই প্রয়োজনীয়। তবে বলা দরকার, বাজেট বরাদ্দে সরকারের কৃষি ভাবনার যে প্রতিফলন দেখা গিয়েছে, তা কিন্তু একটি আর্থিক বর্ষের কাজ নয়। আগামী দিনেও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের জন্য দেখতে চাই একইরকম কৃষক-দরদি বরাদ্দ। কৃষককে আমরা বলি জাতির মেরুদণ্ড, আমাদের দেশকে আমরা বর্ণনা করে থাকি কৃষি-নির্ভর বলে, শব্দগুলো যে নিছক বিশেষণ নয়, তা আগামী সময়েও আমরা দেখাত চাই। আর এইভাবেই দেশের বড় অংশের জনসমষ্টির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে চাই।❑

[লেখক শস্য-বিজ্ঞানে ডক্টরেট, কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লেখেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পেশাগতভাবে দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত আছেন।]

উল্লেখপঞ্জি :

agricoop.nic.in

finmin.nic.in/VikasKaBudget

indiabudget.nic.in/ub2016-17/bh/bh1.pdf

pib.nic.in

www.nccd.gov.in/PDF/KeyFeatures-Budget2016-17.pdf

Toppers of all the deptts. are from Academic Association

Rank-4 in Executive

Abhishek Basu

Rank-7 in Executive

Abida Sultana

Rank-10 in Executive

Mithun Majumder

Rank-1 in CTO

Suraiya Ghaffar

Rank-2 in CTO

Md. Shabbar Khan

Rank-4 in CTO

Amartya Debnath

Rank-2 in DSP

Saquib Ahmed

Rank-4 in DSP

Rohed Shaikh

Rank-6 in DSP

Mohtashim Akhtar

Rank-7 in DSP

Moumita Sen

Rank-10 in DSP

Suprakash Das

Rank-1 in Food

Prasanta Mahapatra

Rank-6 in Food

Mofidul Islam

Rank-10 in Food

Arindam Dutta

Rank-8 in ADSR

Partha Samaddar

Rank-10 in ADSR

Biswajit Das

Rank-8 in Emp. Ser.

Sanjib Naskar

Rank-1 in AITO

Amartya Kr. Shi

WBCS-2014 (A & B)
একটি মাত্র সেন্টার থেকে
Gr.-A তে **29** জন এবং
Gr.-B তে **14** জন।
মোট **43** জন সফল।

ইন্টারভিউ : WBCS-2015তেই হোক স্বপ্নপূরণ

'ইন্টারভিউ হল লুডোর ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু —তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।'

ইন্টারভিউয়ে একচান্সে সাফল্যলাভের জন্য আপনাকে জানতে হবে কতকগুলি HOWs এবং WHATs এর উত্তর

- আপনি কিভাবে নিজের স্ট্রেংথকে প্রকাশ করবেন বা কিভাবে দুর্বলতার জায়গাগুলিকে লুকোবেন।
- ইন্টারভিউয়ে আপনার সঠিক অ্যাপ্রোচ এবং অ্যাটিটিউড কেমন হবে।
- স্ট্রেস ইন্টারভিউ আপনি কিভাবে সামলাবেন।
- কিভাবে তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন।
- ইন্টারভিউয়ের সময় বডি মুভমেন্ট এবং পস্চার কেমন হবে।
- কিভাবে বোর্ড সদস্যদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন।

WBSSC CGL-2014 Interview ব্যাচে ভর্তি চলছে।

- রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়গুলিকে কিভাবে সামলাবেন।
- আপনার পছন্দের পদগুলিকে কিভাবে সাজাবেন।
- আপনার বায়োডাটা থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে বা তার উত্তরই বা কি হবে।

স্ট্রেস, বিহেভিওরাল, নর্ম্যাল- সবধরনের ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি এখানে

বি.টেক -এর ছাত্রী হওয়ায় আমার ক্ষেত্রে প্রায় সব বিষয়ই নতুন। প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে পড়াশুনো শুরু করে প্রথমবারেই আমি ডব্লুবিসিএস এক্সিকিউটিভ এর লিস্টে নিজের নাম খুঁজে পেয়েছি এবং ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিককে সবরকম ভাবে পাশে পেয়েছি। স্ট্রেস, বিহেভিওরাল, নর্ম্যাল —সবরকমের ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি এখানে। শুধু বাংলা, শুধু ইংরাজী অথবা বাংলা ইংরাজী সব মাধ্যমেই ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে এসেই। তাই ইন্টারভিউতে আমার এই সাফল্যের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। —**নির্মীতা সাহা,** WBCS (Exe)-2014

ইন্টারভিউ ক্লাসে ভর্তি চলছে

এছাড়াও আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে এখানে যা পাবেন—

- WBCS-2014, 2013, 2012, 2011 ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন ১৫০০+ প্রশ্ন।
- কমপ্লিট স্টাডি কিট।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং WBCS টপারদের সামনে প্রচুর মক ইন্টারভিউ।
- আই.এ.এস-টপারদের ইন্টারভিউয়ের 'সাকসেস ফান্ডা'।
- ইন্টারভিউ সম্পর্কে ডব্লুবিসিএস টপারদের অভিজ্ঞ মতামত।
- CTO/ACTO, BDO/Jt BDO এবং DSP কে প্রথম চয়েস দেওয়ার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি।
- ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতা দূরীকরণের উপায়।

অ্যাকাডেমিকে ছাত্র শিক্ষকের রয়াসন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পড়াশুনার ধরণটা এক কথায় অনন্য

DSP, WBCS-2014

আমার ক্ষেত্রে ডব্লুবিসিএস ছিল একটা স্বপ্ন। সেটা সত্যি হয়েছে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের হাত ধরে। SI হিসাবে পুলিশে ট্রেনিংরত অবস্থায় যখন পরীক্ষার জন্য রাতজেগে প্রস্তুতি নিতাম এবং আসুরিক পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়লেও মনোবল হারায়নি।

অ্যাকাডেমিকে যোগ দিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম সফলতার রহস্য এর নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। আসলে এখানে ছাত্র শিক্ষকের রসায়ন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে পড়াশুনার ধরণটাই মনোবল আমার বাড়িয়ে দেয়। WBCS এবং WBPS এ সফল দাদা দিদিদের সহচর্যে সফলতার মন্ত্রবীজ রোপিত হয় এখানে, তার মহীরূহই হল এই সাফল্য।

—**সুমন কান্তি ঘোষ,** DSP, WBCS-2014

WBCS-2016 মেনস মক্ টেস্ট

এতে আপনি পাবেন— ● 30টি মক টেস্ট (১০০ নম্বরের প্রতিটি) ● 40-50 টি ক্লাস টেস্ট ● সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নোটস্ ● সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ই.ভি.এস-এর নোটস্ ● সামিম স্যার ও অন্যান্য অভিজ্ঞ স্যারদের স্ট্র্যাটেজি ক্লাস। **মেনস মক টেস্টের ব্যাচে ভর্তি চলছে।**

WBCS-2017 ব্যাচে ভর্তি চলছে। আসন সংখ্যা সীমিত।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

© 9038786000
© 9674478644

Website: www.academicassociation.in • Centre: Uluberia-9051392240 • Barasat-9800946498 • Birati-9674447451 • Paschim Medinipur-9474736230 • Darjeeling-9832041123 • Berharampur-9775333007

শক্ত ভিতের সন্ধানে

ভারতের আমজনতা। কারা? আসলে ভারতের আমজনতা মূলত অনুন্নত, কৃষিনির্ভর এক গোষ্ঠী। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নতি ছাড়া এ দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁরা এই বাজেটের থেকে কীভাবে লাভান্বিত হবেন, আলোকপাত করছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

বাজেটটা খুব তেতো লাগছে আমজনতার। লাগবারই কথা। কেননা বাজেট নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, এই বাজেটে তাঁদের জন্য এমন কিছু নেই যে চায়ের কাপে তুফান ছোটাবেন। কিন্তু সংখ্যায় এরা কজন? ১২৫ কোটির দেশে মেরেকেটে তার ৩ শতাংশ। এঁরা আসলে তাঁরা, যাঁরা প্রত্যক্ষ করের বোঝা বহন করেন। বাজেট বক্তৃতা সাঙ্গ হবার ঘণ্টা কয়েক পরে আমার এক সহকর্মী ফোন করেছিলেন। 'হ্যাঁরে, মার্চের মধ্যে যদি পিএফ থেকে নন-রিফান্ডেবল উইথড্র করি তাহলে তো আর ট্যাক্স দিতে হবে না?' বাজেট নিয়ে আমজনতার যে অংশ আলোচনা-সমালোচনা করেন আমার সহকর্মী তাঁদেরই একজন, ট্যাক্সপেয়ার। বলাবাহুল্য এই করদাতা বা ট্যাক্সপেয়ারদের দিকে তাকিয়ে তাঁর তৃতীয় বাজেট পেশ করেননি অরুণ জেটলি। বাজেটের আলোচনায় তাই তিতকুটে আস্বাদ স্বাভাবিক।

এই বাজেট আমজনতার। করদাতাদের ক্ষুদ্র বৃত্তের বাইরে যে বৃহত্তর আমজনতা, তাদের। আমাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তম অংশ এখন আসে পরিষেবা ক্ষেত্র থেকে। কিন্তু জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল। এই বৈপরীত্যেরই চূড়ান্ত ফলশ্রুতি নিদারুণ আয় বৈষম্য। আর সেই আয় বৈষম্যের ফল? কৃষিক্ষেত্র থেকে যে চাহিদা উদ্ভূত হয় তা ক্রমশই কমে আসছে আর এই চাহিদা হ্রাস নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সমগ্র অর্থনীতির উপর।

কৃষিক্ষেত্রের হাল ফেরানো তাই ক্রমশই সময়ের দাবি হয়ে উঠছিল। কৃষিক্ষেত্রের অবস্থার সাম্প্রতিক অবনতি আরও ঘটেছে পরপর দু বছরের খরা পরিস্থিতির কারণে। অরুণ জেটলি তাই পাখির চোখ করেছেন কৃষিক্ষেত্র, কৃষিজীবী মানুষ ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে।

একটা সময় ছিল যখন ভারতের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান থাকত উল্লেখযোগ্য, কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ঘোরাফেরা করত দুই থেকে তিন শতাংশের মধ্যে। কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির সেই হার উনিশশো নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে কমতে কমতে একে নেমেছে, একের তলাতেও নেমেছে। অর্থনীতিবিদরা বারবার দুটি জিনিসের দিকে আঙুল তুলেছেন কৃষিক্ষেত্রের এই বেহাল অবস্থাটির জন্য। এক, সেচ সুবিধার অপ্রতুলতা। দুই, সরকারি বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমানতা। সেচ সুবিধার সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সিঞ্চন যোজনাকে জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। এই যোজনায় ২৮.৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হবে। এছাড়া অ্যাক্সিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিট প্রোগ্রামের অধীনে যে ৮৯টি সেচ প্রকল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে সেগুলিকে দ্রুত সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি প্রকল্প চলতি অর্থবর্ষেই শেষ করা হবে। আর এই ব্যাপারে নতুন যেটা করা হয়েছে সেটা হল সেচ প্রকল্পগুলি গড়ে তোলার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই তহবিলটির দেখাশোনা করবে নাবার্ড। তহবিলটির প্রাথমিক আয়তন ধরা হয়েছে ২০০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে চলতি অর্থবর্ষে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১২৫১৭ কোটি টাকা। বাকি টাকা সংগ্রহ করা হবে বাজার থেকে। তবে এই প্রসঙ্গে চমক যেটা, সেটা আছে ঠিক পরের প্রস্তাবে। পরিবেশচর্চার দৌলতে এখন একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে চাষের কাজে মাটির নীচের জল যত তুলে নেওয়া হচ্ছে তত টান পড়তে শুরু করেছে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের ভাঁড়ারে। অর্থমন্ত্রী বোধহয় এই কারণেই সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কথা বলার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনার জন্য ৬০০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন।

কৃষির উন্নতির জন্য সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। বলার কারণ অনাবৃষ্টি, স্বল্পবৃষ্টির কারণে ফলন মার খাবার ঘটনা এ দেশে নিত্যনৈমিত্তিক। তেমন কিছু অস্বাভাবিকও নয় সেটা। এত বড় দেশ। আর কৃষি তো অনেকটাই প্রকৃতিনির্ভর। কিন্তু অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি ছাড়া অতিবৃষ্টির কারণেও ফসল নষ্ট হয়। সেটা থেকে গরিব

চাষিকে সুরক্ষা দেবার জন্য কোনও উপায় কিন্তু নেই, একমাত্র বিমা সুরক্ষা দেওয়া ছাড়া। সরকারি তরফে এমন কোনও সুরক্ষা দেবার বন্দোবস্ত এতদিন ছিল না। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা' নামে নতুন একটি বিমা যোজনার কথা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, চলতি অর্থবর্ষে তার জন্য বরাদ্দ করেছেন ৫৫০০ কোটি টাকা। এমন একটি প্রকল্প কিন্তু সত্যিই জরুরি ছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতির চাহিদা বৃদ্ধির জন্য অর্থমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বাড়ানোর কথা বলেছেন। তার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি বাড়ানো প্রয়োজন সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ফলন বাড়ল আর বাড়তি ফসল চাষির গোলাতেই পড়ে রইল, তাতে তো কোনও লাভ নেই। অথচ ভারতীয় চাষিদের সামনে এটা একটা বড় সমস্যা, ফসল ঠিকঠাক বিক্রির সমস্যা। চাষিরা ফসলের দাম না পেলে সরকার এখন ন্যূনতম সহায়ক দাম ঘোষণা করে। চাষিরা সেই দামে তাদের বিক্রয়যোগ্য ফসল ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার কাছে বিক্রি করে। কিন্তু এই পুরো প্রক্রিয়াটি শুনতে যতটা সহজ, কার্যত তত সহজ নয়। ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার গুদাম সর্বত্র থাকে না। ফলে সেখানে পৌঁছোনোটা চাষিদের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ছোট ছোট নিরক্ষর চাষিরা এসব সহায়ক দাম-টামের খোঁজ রাখে না। ফলে যেটা হয় বড় চাষিরা বা ফড়েরা সরকারের এই সহায়ক দামের সুযোগটা নিয়ে নেয়, ফাঁকে পড়ে যায়, দরকারটা যাদের বেশি তারা। উৎপাদিত ফসল বিক্রির এই অসুবিধে দূর করতে দেশের নির্বাচিত ৫৮৫টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজারে ই-বাজার গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এটিকে বলা হচ্ছে ইউনিফায়েড অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং স্কিম। একইভাবে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার মাধ্যমে একটি অনলাইন সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যে দেশে অধিকাংশ চাষি নিরক্ষর, সেখানে এই সব ই-মার্কেটিং বা ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কতটা সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব? আদৌ সম্ভব কি? বরং রাজ্য সরকারগুলিকে খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য যে কথাটি বলা হয়েছে তা অনেকটাই বাস্তবসম্মত। এছাড়া সংগৃহীত খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখার ব্যাপারে ফুড কর্পোরেশনের গুদামগুলিতে স্থান সংকুলানের অভাব পূরণের জন্য সেগুলির সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ানোর প্রস্তাবটিও সদর্থক। ঠিক যেমন সদর্থক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নতির প্রস্তাবটি। রাস্তাঘাটের উন্নতি হলে গ্রামের সঙ্গে বাজারের সংযোগ বাড়বে, পকেট ভারী হবে চাষিদের, চাহিদার টানে বাড়বে অর্থনীতির উৎপাদন।

তবে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতির অর্থ কেবল চাষির উন্নতি নয়। এক টুকরো হলেও জমির মালিক আর কজনই বা? কৃষকের থেকে কৃষি-মজুরের সংখ্যা অনেক বেশি। তার থেকে বড় কথা কৃষক পরিবারেও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে ছোট্ট এক টুকরো জমির পক্ষে সেই পরিমাণ মানুষকে ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং শুধু চাষের উপর নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটানো সম্ভব নয়। বিগত দু-এক বছর উপেক্ষার পর এবার আবার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পটির উপর। তবে এই প্রকল্পে যে সমস্ত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় তা তো মূলত অশিক্ষিত, কায়িক শ্রমজীবীদের জন্য। কিন্তু বর্তমান ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। আর এখন তো প্রথাগত সাক্ষরতার চেয়ে কর্মজগতের জন্য অধিকতর প্রয়োজন কম্পিউটার লিটারেসির। তাই গ্রামীণ ভারতের জন্য একটি নতুন 'ডিজিটাল লিটারেসি মিশন স্কিম'-এর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। তবে এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি পরে জানানো হবে।

দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার প্রকল্পটি আগেই হাতে নেওয়া হয়েছিল। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ না পৌঁছোলেও গ্রামে গ্রামে খুঁটি পৌঁছোচ্ছে। যদিও খুঁটি পৌঁছোনোর এই কাজও করে ওঠা যায়নি আনুমানিক ১৮৫৪২টি গ্রামে। ২০১৮ সালের মে মাসের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে বাজেটে। রাস্তা তৈরি, বিদ্যুতায়ন, এইসব কাজ জরুরি। পরিকাঠামোর এই ন্যূনতম বিকাশটুকু না ঘটলে বর্তমানে কোনও অর্থনীতিই উন্নত হয়ে উঠতে পারে না।

তবে প্রকৃত অর্থে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এই বাজেটে নিয়েছেন অরুণ জেটলি। সকলের জন্য স্বাস্থ্যবিমা চালু। বাজেট প্রস্তাব অনুযায়ী দরিদ্র ও আর্থনীতিকভাবে দুর্বল পরিবারের সদস্যরা এই বিমার সুযোগ পাবেন। পরিবারপিছু বিমার অঙ্কটি হবে ১ লক্ষ টাকা। পরিবারে ষাট বছরের বেশি বয়স্ক সদস্য থাকলে বিমার অঙ্কটি ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়বে। তবে দরিদ্র ও আর্থনীতিকভাবে দুর্বল পরিবার চিহ্নিত করার মাপকাঠি কী হবে, বা বিমার কিস্তি পুরোটাই সরকার দেবে না কিছুটা সংশ্লিষ্ট পরিবার দেবে, সে সমস্ত ব্যাপারে বিশদে কিছু বলা হয়নি। সে যাই হোক, এই প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে আয় বিশেষ না বাড়লেও এই বিমা সুরক্ষা থাকলে দরিদ্র পরিবারগুলির মধ্যে খরচের প্রবণতা বাড়বে। বাড়বে কারণ, অসুস্থতাজনিত বিপদ-আপদের আশঙ্কায় প্রতিটি পরিবারকেই কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে হয়, তা সে যত দরিদ্র পরিবারই হোক। বিমা সুরক্ষা থাকলে সেই টাকাটা আর রাখতে হবে না। চিকিৎসাবাবদ দুশ্চিন্তাকে আরও একটু কমাতে প্রধানমন্ত্রী জন-ঔষধি যোজনার অধীনে ৩০০০টি জেনেরিক ওষুধের দোকান চালু করা হবে চলতি অর্থবর্ষে। বিশ্ব বাণিজ্য

সংস্থার সদস্য হবার সুবাদে ২০০5 সালে পেটেন্ট আইন সংশোধন করার পর থেকে এ দেশে অ্যালোপ্যাথি ওযুধের দাম যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে এই প্রস্তাবও যে গরিব মানুষকে অনেকটা স্বস্তি দেবে তা বলাবাহুল্য। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম রসদগুলি সংগ্রহের সুবিধা করে দিলে; শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকারের মতো প্রাথমিক বিষয়গুলিকে স্বীকৃতি দিলে তা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে আখেরে অর্থনীতিরই লাভ করে।

যে যুক্তিতে এবারের বাজেট গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষকের পকেটের উন্নতির দিকে মন দিয়েছে, সেই একই যুক্তিতে যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির দিকেও নজর দিয়েছে। বস্তুত এই যুক্তিটাই এই বাজেটের জোরের দিক। যুক্তিটা একটা শক্তপোক্ত ভিত তৈরির। আজ থেকে আটষট্টি বছর আগে ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন দেশটি ছিল অনুন্নত, কৃষি-নির্ভর এক দেশ। সেই দেশ আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান আর্থনীতিক শক্তি হবার দিকে এগোচ্ছে। এগোচ্ছে অর্থনীতির উন্নতির কারণেই। সমস্যা হচ্ছে এই উন্নয়ন এখনও স্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারছে না। এবং পারছে যে না, তার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনীতি এখনও একটা শক্তপোক্ত ভিতের উপর নিজেকে দাঁড় করাতে পারেনি।

মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের হালহকিকত

বছর	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (প্রস্তাবিত)
মোট খরচ (কোটি টাকা)	৩৯৭৭৮	৩৮৫৫২	৩৬০২৬	৩৬৬৫২	৩৮৫০০
মোট নিয়োগ (১০ লক্ষ জনের হিসাবে)	৭৯.৭	৭৩.৯	৬২.২	৬২.৩	—
পুরো ১০০ দিনের কাজ পেয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা (১০ লক্ষ জনের হিসাবে)	৫.১৭	৪.৬৫	২.৪৯	২.৬১	—

আমাদের অন্যতম প্রধান দুই শক্তির একটি হল মানবসম্পদের বিপুল ভাণ্ডার, অন্যটি বিস্তীর্ণ, উর্বর কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু 'শিল্পের উন্নতি না ঘটাতে পারলে অর্থনীতির উন্নয়ন অসম্ভব', অর্থনীতির এই পাঠকে মান্যতা দিতে গিয়ে আমরা ভুলে গেছি আরেকটি সহজতর পাঠ, 'কৃষির উন্নতিই পারে শিল্পোন্নতির একটি যথার্থ ভিত তৈরি করতে।' ভুলে গেছি বলেই কৃষিক্ষেত্রে পরপর দু বছরের খরাতেই টলমল করে উঠেছে শিল্পের ভবিষ্যৎ। সৌভাগ্যের কথা, অর্থনীতির এই সামান্য নড়বড়ানিতেই সরকারের টনক নড়েছে। সরকার কেবল কৃষির উন্নতির কথা ভাবেননি, রাস্তা বা বিদ্যুতের মতো প্রাথমিক পরিকাঠামোগুলির বিকাশের দিকেও নজর দিয়েছেন। একবার এই উন্নতিগুলি ঘটিয়ে ফেলতে পারলে তখন কৃষি ও শিল্প, একে অন্যকে টানতে শুরু করবে, তরতর করে এগোবে অর্থনীতি।

আর মানবসম্পদ। ভারতের সবচেয়ে বড় জোরের, পাশাপাশি সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গাটি তো এটিই, বিপুল জনসংখ্যা। বিপুল জনসংখ্যাকে বিপুল মানবসম্পদে পরিণত করতে গেলে দরকার দুটি জিনিসের, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের। শিক্ষার অধিকারের দিকে আগেই নজর পড়েছিল, এবার পড়ল স্বাস্থ্যের দিকে। শক্তপোক্ত এই স্তম্ভগুলিই আজ জরুরি প্রয়োজন ভারতীয় অর্থনীতির।

বাজেট নিয়ে এই পর্যন্ত যে আলোচনা হল তা অতি সামান্যই। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। দীর্ঘ আলোচনা সবসময় সুখপাঠ্য হয় না, সুখশ্রাব্যও নয়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বাজেটের দিশামুখটির অনুধাবন। সম্ভবত সে কাজ হয়ে গেছে।❑

[লেখক অর্থনীতির অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক।]

প্র। চ্ছ। দ। নি। ব। ন্ধ

সংস্কার ও সামাজিক ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব

বাজেট ২০১৬-১৭ ও ব্যাংকিং ক্ষেত্র

পরিকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদ গড়া থেকে কর্মসংস্থান হোক বা আবাসন, আর্থিক রসদ জোগানোর ক্ষেত্রে ব্যাংকিং পরিষেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যে কোনও পরিবর্তনের প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী, প্রভাবিত হতে পারে বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক বাজারও। নতুন বাজেটে ব্যাংকিং ক্ষেত্রের জন্য যে সব সংস্থান করা হয়েছে, সে সব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন **তপন কুমার ভট্টাচার্য।**

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি গত ২৯ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় পেশ করলেন ২০১৬-১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট। এটি তাঁর তৃতীয় বাজেট (যদিও প্রথম বাজেটটি ছিল আংশিক সময়ের বাজেট)। বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের জন্য মোট ব্যয় ধরেছেন ১৯,৭৮,০৬০ কোটি টাকা এবং এর মধ্যে পরিকল্পনাখাতে এবং পরিকল্পনা-বহির্ভূতখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ধরেছেন যথাক্রমে ৫,৫০,০১০ কোটি টাকা এবং ১৪,২৮,০৫০ কোটি টাকা। রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫,৩৩,৯০৪ কোটি টাকা এবং প্রাথমিক ঘাটতির পরিমাণ ৪১,২৩৪ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সালের রাজকোষ ঘাটতি মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৫ শতাংশে আটকে রাখা যাবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। এমনকী ২০১৫-১৬ সালের রাজকোষ ঘাটতিও মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৯ শতাংশে ধরে রেখে গত বছর দেওয়া প্রতিশ্রুতিও তিনি পূরণ করেছেন।

বাজেটে অর্থনীতির এক আশাপ্রদ ছবি অর্থমন্ত্রী ফুটিয়ে তুলেছেন। সারা পৃথিবীতেই যেখানে অর্থনীতির গতি শ্লথ সেখানে আমাদের ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি প্রশংসার দাবি রাখে। আর বৃদ্ধির গতিকে সচল রাখতে এবং সেই গতিকে আরও দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল ব্যাংকিং ক্ষেত্র। অর্থমন্ত্রী বাজেটকে নয়টি পিলারের ওপর দাঁড় করিয়েছেন। এর মধ্যে ছয় নম্বর পিলারটি হল দেশের আর্থিক ক্ষেত্রের সংস্কার, স্বচ্ছতা এবং স্থিতিশীলতার বিষয়গুলি। এছাড়াও অন্যান্য পিলারগুলিতেও ব্যাংকিং ক্ষেত্রের উপস্থিতি রয়েছে। প্রথমে কৃষির বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

কৃষি ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে

দেশের অর্ধেক মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও দেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান মাত্র ১৭.৪ শতাংশ। দ্বাদশ পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশ ধরা হলেও ২০১৪-১৫ সালে এই বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে (–) ০.২ শতাংশ। ২০১৫-১৬ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৫৩.১৬ মিলিয়ন টন যা ২০১৪-১৫-র চেয়ে মাত্র ১.১৪ মিলিয়ন টন বেশি।

কৃষি উৎপাদন বাড়াতে উন্নত মানের সার, বীজ, সেচের জল এবং অন্যান্য উপাদান ও পরিকাঠামো ছাড়াও আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল ঋণ-সহায়তা। সময়মতো হাতে টাকা না পেলে চাষ-আবাদ করা সম্ভব নয় এবং কাজটা ফেলে রাখাও যায় না। খরিফের শস্য খরিফ মরশুমেই বপন করতে হবে, শীতকালের জন্য ফেলে রাখা যাবে না। সুতরাং সময়মতোই চাষির কাছে কম সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ পৌঁছে দিতে হবে। এ ব্যাপারে প্রতি বছরই বাজেটে ব্যাংকঋণের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়। অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের জন্য ৯ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাংকঋণের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন এবং শ্লাঘা প্রকাশ করে বলেছেন এই পরিমাণটা হল এ যাবৎকাল বিভিন্ন বাজেটে ঘোষিত ব্যাংক ঋণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে ব্যাংকঋণের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৮,৫০,০০০ কোটি টাকা। এছাড়াও কৃষিঋণের সুদের ভরতুকি বাবদ তিনি বাজেটে বরাদ্দ করেছেন ১৫,০০০ কোটি টাকা। এই ভরতুকিটা অবশ্য শস্যঋণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে যাঁরা স্বল্পমেয়াদি শস্য বপন করবেন তাঁদের কাছ থেকে ব্যাংক ৭ শতাংশ সুদ নেবে আর যাঁরা সময়মতো এই ঋণ পরিশোধ করবেন তাঁদের কাছ থেকে সুদ নেবে ৪ শতাংশ। কম সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার ব্যাংকগুলিকে ভরতুকি দেবে।

অর্থমন্ত্রী বাজেটে 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা'-র জন্য বরাদ্দ করেছেন ৫,৫০০ কোটি টাকা। আমাদের দেশের কৃষকরা নানান ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। এর আগে একাধিক শস্য-বিমা থাকলেও সেগুলি সেভাবে কৃষকদের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাছাড়া সেগুলির ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম ছিল বেশি এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল কম। প্রধানমন্ত্রী বাজেটের এক মাস আগে জানুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন এই বিমা প্রকল্প। খরিফ ও রবি ফসলের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম যথাক্রমে রাখা হয়েছে মোট বিমাকৃত অর্থের মাত্র ২ শতাংশ এবং ১.৫ শতাংশ। এই নতুন প্রকল্প ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাতিল করা হয়েছে আগের চালু থাকা দুটি প্রকল্প—'জাতীয় কৃষিবিমা স্কিম' এবং 'সংশোধিত জাতীয় কৃষিবিমা স্কিম'। এই বিমা প্রকল্প চালু হওয়ায় ব্যাংকগুলিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে শস্যঋণ অনাদায়ি হলে বিমার টাকা থেকে সেই অনাদায়ি ঋণের অনেকটাই উসুল করতে পারবে।

কৃষিঋণের পরিমাণ বাড়লেও এই ঋণের বেশির ভাগটাই হল শস্য ঋণ যা স্বল্পমেয়াদে দেওয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদি কৃষিঋণেই কৃষিক্ষেত্রে মূলধন গঠন সম্ভব হয়। কিন্তু এই দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। ২০০৬-০৭ সালে যেখানে এই ঋণের পরিমাণ ছিল মোট কৃষিঋণের ৫৫ শতাংশ ২০১১-১২ সালে সেখানে পরিমাণটা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশ, যদিও কৃষিঋণ এবং কৃষিক্ষেত্রে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ১৯৯৯-২০০০ সালের ১০ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ সালে ৩৮ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। কৃষিঋণের ক্ষেত্রে আর একটা দুর্বলতার দিক হল বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্রগুলি এখনও কৃষিঋণের এক বড় অংশের জোগানদার। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৭০তম সমীক্ষা থেকে জানা যায় কৃষির জন্য মোট তহবিলের ৪০ শতাংশই আসছে এই সব ক্ষেত্র থেকে, তাছাড়া স্থানীয় মহাজনরাও প্রায় ২৬ শতাংশ তহবিল নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সব বিধিবহির্ভূত ক্ষেত্র এবং স্থানীয় মহাজনদের সুদের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়ায় চাষিরা ঋণের ফাঁদে আটকে পড়ছেন এবং পরিণামে অনেকে আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছেন।

ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগগুলিকে আর্থিক সহায়তা

দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের উৎপাদন শিল্পে ৪০ শতাংশ এবং রপ্তানি বাণিজ্যে ৪৫ শতাংশ অবদান রয়েছে এই ক্ষেত্রগুলির। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও কৃষির পরেই রয়েছে এদের স্থান, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এক বক্তৃতায় বলেছেন, বড় শিল্পগুলি যেখানে দেশের ১ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করতে পেরেছে সেখানে ক্ষুদ্র উদ্যোগে কর্মসংস্থান হয়েছে ১২ কোটি মানুষের। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন বড় বড় শিল্পগুলিকে যখন প্রভূত সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তখন ছোট উদ্যোগগুলির দিকেও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। দেশে রয়েছেন অসংখ্য স্বনিযুক্ত উদ্যোগী যাঁদের হাতে রয়েছে ১১ লক্ষ কোটি টাকার তহবিল এবং যাঁরা ১২ কোটি ভারতবাসীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই সব উদ্যোগীদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ মাত্র ১৭,০০০ টাকা এবং মাথাপিছু এই সামান্য ঋণ দিয়ে তাঁরা এত মানুষের কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন। মোদী জানিয়েছেন, এই বিষয়গুলিই তাঁকে মুদ্রা ব্যাংক তৈরির কথা ভাবিয়েছে। গত বছরের বাজেটেই মুদ্রা ব্যাংক বা মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট রিফাইন্যান্স এজেন্সি গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। মুদ্রা ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহজ শর্তে ঋণ দেবে যাতে তারা সেই ঋণের টাকা দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে বেশি করে ঋণ মঞ্জুর করতে উৎসাহিত হয়। গত বছরের বাজেটে এই নতুন ব্যাংকের মূলধন বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছিল ২০,০০০ কোটি টাকা। তাছাড়া ব্যাংকের আওতাভুক্ত ঋণ-জামিন তহবিলের মূলধন বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছিল আরও ৩০০০ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী এবারের বাজেটে জানিয়েছেন মুদ্রা ব্যাংক সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে এবং গত এক বছরে প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ উদ্যোগীর কাছে এই ঋণ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে এই খাতে আগামী বছরের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছেন ১,৮০,০০০ কোটি টাকা। আশা করা যায় এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগকে আরও বেশি পরিমাণ ঋণ দেওয়া সম্ভব হবে এবং আরও বেশি সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গৃহ ঋণ

খাদ্য, বস্ত্রের পর মানুষের প্রয়োজন মাথা গোঁজার আস্তানা। এখনও দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ কাঁচা বাড়িতে বাস করেন, যেখানে ছাদ বলতে খড়, টালি বা টিনের ছাউনি আর চারদিকের দেওয়াল বলতে মাটির বা চাটাইয়ের দেওয়াল। সকলের জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা করতে সরকার একের পর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনা, রাজীব আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রভৃতি। ইন্দিরা আবাস যোজনায় ২০১৩-১৪ সালে গ্রামাঞ্চলে ২৪ লক্ষ ৮১ হাজার পাকা বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল এবং ওই বছরের শেষে ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার পাকা বাড়ি নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল এবং আরও ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার বাড়ির নির্মাণ কাজ চালানো হচ্ছিল। অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাবে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সরকারের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও মধ্যবিত্তদের গৃহ সমস্যা মেটাতে গৃহঋণের সুদের ওপর অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা ছাড় দেবার কথাও তিনি ঘোষণা করেছেন এবং এজন্য আয়কর আইনে নতুন 80EE ধারা সংযোজন করেছেন। এর আগে গৃহ ঋণের সুদ বাবদ ছাড়ের পরিমাণটা ছিল দু লক্ষ টাকা। তবে এই সুবিধা পেতে হলে ২০১৬-১৭ সালেই লোনটা নিতে হবে, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের দাম ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে চলবে না, লোনের পরিমাণও ৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং ঋণ মঞ্জুর হবার তারিখে ওই ব্যক্তির নামে অন্য কোনও বাসস্থান থাকা চলবে না। এর ফলে এই সব স্বল্পমূল্যের বাড়ির চাহিদা বাড়বে, মানুষের বাসস্থানের সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে এবং ব্যাংকঋণের পরিমাণও বাড়বে।

অনুৎপাদক ঋণ

বর্তমানে ব্যাংকগুলি অনুৎপাদক ঋণের ভারে জেরবার। একটার পর একটা লোন অ্যাকাউন্ট অনুৎপাদক সম্পদে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে ব্যাংকগুলির লাভের পরিমাণও দ্রুত কমছে। কারণ অনুৎপাদক ঋণের জন্য প্রভিশন বা সংস্থান ব্যাংকের লাভ থেকেই করা হয় এবং ফলে লাভের পরিমাণটা কমে যায়। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি এ ব্যাপারে কঠোর হওয়ায় (অর্থাৎ ব্যাংকগুলি যাতে কোনও অনুৎপাদক ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখাতে না পারে বা প্রভিশনও কমিয়ে দেখাতে না পারে) ২০১৫-১৬ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) দেখা যায় সরকারি ব্যাংকগুলিকে বকেয়া ঋণের ওপর সংস্থান করতে হয়েছে ৪৩,৭১৭ কোটি টাকা যা আগের বছরের

একই সময়ের দ্বিগুণ। এর ফলে ১১টি সরকারি ব্যাংককে লোকসানে পড়তে হয়েছে এবং ৮টিতে লাভের পরিমাণ অনেকটাই কমে গিয়েছে। ২০১৫-র ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলির মোট অনুৎপাদক সম্পদ বা গ্রস এনপিএ-র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,৩৭,৮৬০ কোটি টাকা।

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যাঁরা শোধ করেননি তাঁদের মধ্যে ছোট অঙ্কের ঋণগ্রহীতারা যেমন রয়েছেন সেরকম রয়েছেন বৃহৎ ঋণগ্রহীতারা। শেষোক্ত ব্যক্তিরা সংখ্যায় কম হলেও টাকার অঙ্কে পরিমাণটা বিশাল এবং এঁদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে লোনের টাকা বাকি রেখেছেন। সরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যায় মোটা টাকার ঋণ নিয়েছেন, কিন্তু শোধ করেননি এরকম ৩০টি অ্যাকাউন্টে বকেয়া লোনের পরিমাণ ৯০,০০০ কোটি টাকা।

ব্যাংকের এই অনুৎপাদক সম্পদ বা এনপিএ কমিয়ে আনতে বাজেটে অর্থমন্ত্রী বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি সারফেইসি (SARFAESI) আইনের সংস্কারের কথা বলেছেন। পুরো কথাটা হল Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002। এই আইনের দুটো দিক রয়েছে। একটি হল ঋণ শোধ না হলে ব্যাংক নিজেই ঋণগ্রহীতার বন্ধকি সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে এবং সেই সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণের টাকা উসুল করতে পারবে আর এ জন্য তাদের কোর্টে মামলা করার প্রয়োজন হবে না। দ্বিতীয়টি হল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ARC) গঠনের প্রস্তাব। এই এআরসি বা সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানির কাজ হবে ব্যাংকের কাছ থেকে বন্ধকি ঋণ কিনে নেওয়া। এর ফলে ব্যাংক অনাদায়ি ঋণের বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে পারবে। অন্যদিকে এআরসি-র বকেয়া লোন আদায়ের ব্যাপারে পেশাদারিত্ব থাকায় তারা ঋণ পুনরুদ্ধারের কাজে নেমে পড়তে পারবে এবং প্রয়োজনে এই সব ঋণের বন্ধকি হিসেবে যে সম্পত্তি রয়েছে সেগুলির ওপর ভিত্তি করে ঋণপত্র ইস্যু করতে পারবে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে প্রস্তাব দিয়েছেন, এআরসি-র মালিকানার একশো শতাংশই কোনও স্পনসরকে দেওয়া যেতে পারে। এত দিন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মালিকানার অংশ ছিল ৪৯ শতাংশ। এখন বিদেশের বহুজাতিক অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানিগুলি ভারতীয় কোম্পানির ১০০ শতাংশের মালিকানা নিতে পারবে। তাছাড়া বাজেটে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীকেও ইস্যুকৃত ঋণপত্রে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সব ব্যবস্থা নেবার ফলে এআরসি কোম্পানিগুলির পেশাদারিত্ব বাড়বে এবং বাড়বে কোম্পানির ইস্যু করা সিকিউরিটাইজেশন রিসিটে (ঋণপত্র) বিনিয়োগের পরিমাণ।

এছাড়া এনপিএ উদ্ধারে অর্থমন্ত্রী ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনালকে আরও শক্তিশালী করার প্রস্তাব দিয়েছেন। এই সব প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে ট্রাইবুন্যালের বর্তমান পরিকাঠামোকে উন্নত করা, কোর্টে কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ানো এবং শুনানির সংখ্যা কমিয়ে এনে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করা। ১৯৯৩ সালের ২৭ আগস্ট গঠন করা হয়েছিল ডিআরটি আইন। ১০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি বকেয়া রয়েছে এ রকম ঋণের টাকা যাতে দ্রুত আদায় করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই গঠন করা হয় এই নতুন ডিআরটি আইন। কিন্তু এই আইনে মামলাগুলি সেভাবে গতি না পাওয়ায় এই সব ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া ২০১৬-১৭ সালে লোকসভায় দেউলিয়া আইন সংক্রান্ত একটি বিল আনার কথাও অর্থমন্ত্রী বলেছেন। আমাদের দেশে ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে কেউ নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলে সেই দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তি পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য রয়েছে ১৯০৯ সালের 'প্রেসিডেন্সি টাউনস্ ইনসলভেন্সি আইন' এবং ১৯২০ সালের 'প্রভিন্সিয়াল ইনসলভেন্সি আইন'। কিন্তু কোনও কোম্পানি ঋণ শোধ করতে না পেরে দেউলিয়া ঘোষণা করলে সেই সংস্থার টাকা বাঁটোয়ারা করবার জন্য দেশে আলাদা কোনও আইন নেই এবং কোম্পানি আইনে হাইকোর্ট এগুলির নিষ্পত্তি করে। কিন্তু এই নতুন আইনে ব্যাংকের বকেয়া ঋণ শোধ হওয়া অনেক সহজ হবে।

সরকারি ব্যাংকের মূলধনি খাতে সহায়তা

ব্যাংকের অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তাদের লাভের পরিমাণ তো কমছেই, সেই সঙ্গে টান পড়ছে তাদের মূলধনের ওপর। কারণ যে কোনও ব্যবসার মতো ব্যাংকের ক্ষেত্রেও ক্ষতিটা মূলধন থেকেই সংস্থান করতে হয়। অর্থাৎ মূলধন বা ক্যাপিটাল কমে যায় এবং নতুন করে মূলধন জোগাড় করতে সচেষ্ট হতে হয়। অন্যথায় সংস্থাটি ক্রমশ রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে সেটি উঠেও যেতে পারে। দেশের ব্যাংকিং ক্ষেত্রের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে সরকারি ব্যাংকগুলি আর এই সব ব্যাংকের মূলধনের একটা বড় অংশের জোগানদার হল সরকার। অন্য দিকে ব্যাসেল-৩-এর নিদান মেনে এই সব ব্যাংকের মূলধনের ভিতকেও আরও শক্তপোক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং মূলধনের পরিমাণ হতে হবে তাদের সম্পদের ১২ শতাংশ, আর যে কোনও ব্যাংকের সম্পদের সিংহ ভাগই হল তাদের দেওয়া দাদন। অর্থাৎ মূলধন না বাড়লে ব্যাংকগুলি তাদের ঋণের পরিমাণও বাড়াতে পারবে না এবং এর ফলে দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যাসেল হল সুইজারল্যান্ডের একটি শহর এবং সেখানে রয়েছে ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট বা বিআইএস। এই ব্যাংকই সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যাংকগুলির কাজকর্মের বিষয়ে নীতি-নির্দেশিকা জারি করে এবং বেশিরভাগ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেগুলি মেনেও নেয়। রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশমতো বর্তমানে আমাদের দেশের ব্যাংকগুলির মূলধন হতে হবে তাদের সম্পদের ৯ শতাংশ এবং ব্যাংকগুলি এই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণও হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে আমাদের দেশের সরকারি ব্যাংকগুলির মূলধন ছিল তাদের সম্পদের ১১.২৪ শতাংশ, যদিও এক বছর আগে পরিমাণটা ছিল আরও বেশি, ১১.৪ শতাংশ। সরকারের হিসাব মতো ব্যাসেল-৩-এর নিয়ম অনুযায়ী ২০১৯ সালের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলির মূলধনের প্রয়োজন হবে

অতিরিক্ত ১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা। নিজেদের লাভ ছাড়াও প্রয়োজন হবে এই অতিরিক্ত মূলধনের। সুতরাং মূলধনের ঘাটতি হলে সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞে এবং পরিকাঠামো খাতে প্রয়োজনমতো ঋণ দেওয়া ব্যাংকগুলির পক্ষে সম্ভব হবে না। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত এই চার বছরে তাদের জোগাড় করতে হবে এই অতিরিক্ত মূলধন। এর মধ্যে সরকারের তরফে ৭০ হাজার কোটি দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকগুলিকে নিজেদেরই বাজার থেকে তুলতে বলা হয়েছে। এই ৭০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০১৫ ও ২০১৬ সালের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ২৫,০০০ কোটি টাকা করে এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ সালের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ১০,০০০ কোটি টাকা করে।

এ বছরের বাজেটে সরকারি ব্যাংকগুলির মূলধনি খাতে অর্থমন্ত্রী ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। অর্থমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রয়োজনে মূলধন খাতে আরও বেশি অর্থ জোগাতেও তিনি পিছপা হবেন না। অবশ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী একথাও বলেছেন যে সরকারি ব্যাংকগুলিকে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতাতেও তাদের এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্য সরকার ব্যাংকগুলিকে মূলধন জোগানোর কথা বললেও এই সব ব্যাংকে নিজেদের অংশীদারিত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার ব্যাপারেও তারা চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। সরকারের লক্ষ্য সরকারি ব্যাংকগুলিতে তাদের অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৫১ থেকে ৫২ শতাংশে নামিয়ে আনা। ইতিমধ্যে আইডিবিআই ব্যাংকে সরকারের শেয়ারের অংশ ৫০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার বিষয়টি যে বিবেচনাধীন রয়েছে সে কথা অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখও করেছেন।

মুদ্রা ও ঋণ নীতি

আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং আরবিআই অ্যাক্ট ১৯৩৪ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাংক পরিচালিত হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের একটি অন্যতম কাজ মুদ্রানীতি ঘোষণা করা। এক সময় এই নীতি ঘোষণা করা হত বছরে দুবার। বলা হত 'মুদ্রা ও ঋণনীতি'। খরিফ মরশুমের ঋণনীতিকে বলা হত 'স্ল্যাক সিজন্ ক্রেডিট পলিসি' এবং রবি মরশুমের ঋণনীতিকে 'বিজি সিজন্ ক্রেডিট পলিসি'। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংক এপ্রিল থেকে শুরু করে দু মাস অন্তর মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। বলা হয় 'মানিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট'। এই মুদ্রানীতির ঘোষণার দিকে সরকার থেকে ব্যবসায়ী মহল এবং কিছুটা সাধারণ মানুষও তাকিয়ে থাকে। কারণ মুদ্রানীতির সঙ্গেই ঘোষণা করা হয় রিজার্ভ ব্যাংকের পলিসি রেট, যেমন রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিয়ো, স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিয়ো প্রভৃতি। সুদ বাড়লে বা কমলে তার প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতে। বর্তমানে বিষয়টা পুরোপুরি রিজার্ভ ব্যাংকের এক্তিয়ারে। অর্থমন্ত্রী বাজেটে আরবিআই অ্যাক্ট ১৯৩৪ সংশোধনের মাধ্যমে একটি স্বাধীন বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই সংস্থাটির নাম হবে 'মানিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড মানিটারি পলিসি কমিটি'। ভবিষ্যতে এই সংস্থাই সুদ নীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থমন্ত্রী বলেছেন এর ফলে নতুন চিন্তাভাবনা সংযোজিত হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্তের বিষয়গুলিও খোলামেলা থাকবে।

বেআইনি আর্থিক সংস্থা রোধে আইন প্রণয়ন

পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেআইনি আর্থিক সংস্থার খপ্পরে পড়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। এরা মানুষকে বেশি অঙ্কের সুদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাছে টানে। তাছাড়া অনেক গরিব মানুষ এজেন্টের পাল্লায় পড়ে বা তাদের জোরাজুরিতে এখানে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু এই সব বিনিয়োগকারীরা বেশিরভাগই টাকা ফেরত পান না। কয়েকটি লগ্নি সংস্থার মালিক অবশ্য গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় সামান্য এবং বেশিরভাগই টাকা-পয়সা নিয়ে উধাও হয়েছে।

এই সব সংস্থাকে চিটফান্ড নামে অভিহিত করা হচ্ছে। চিটফান্ডের ব্যবসাটা কিন্তু বেআইনি নয়। এ ব্যাপারে রয়েছে ১৯৮২ সালের কেন্দ্রীয় আইন এবং ২০০১ সালের সংশোধিত কেন্দ্রীয় আইন। এখানে চিট মানে কিন্তু ঠকানো নয়। বানানটা হল chit যার অর্থ নথি, অর্থাৎ যার ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়। চিট যেখানে ঠকানো সেখানে বানানটা হল cheat। চিটফান্ডের ব্যবসা আমাদের দেশে চলে আসছে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে যখন দেশে ব্যাংক বা বিধিবদ্ধ কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানই তৈরি হয়নি। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে চিটফান্ড বহু বছর ধরেই রমরমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। যে লগ্নি সংস্থাগুলি বেশি সুদের জমা-প্রকল্প বাজারে ছেড়ে মানুষকে প্রলোভিত করে সেগুলিকে বলা হয় পিরামিড বা পন্‌জি মডেল। এই মডেলে নতুন আমানতকারীর টাকা দিয়ে পুরনো আমানতকারীর সুদ মেটানো হয়, আসল টাকা ফেরত দেওয়া হয় এবং এজেন্টদেরও মোটা কমিশন দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গেলে টাকার উৎস শুকিয়ে যায় এবং প্রকল্পটিও লাটে ওঠে। এছাড়াও টাকা তোলা হয় কালেক্টিভ ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে। এই স্কিম অনুযায়ী কোম্পানির তরফে কোনও বিনিয়োগ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয় এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এখানে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকারীরা ভবিষ্যতে মোটা অঙ্কের লাভ ঘরে তুলতে পারবেন।

এভাবেই রাজ্যে রাজ্যে অসংখ্য গরিব মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে ভিখিরিতে পরিণত হচ্ছেন এবং অনেকে আত্মহননের পথও বেছে নিচ্ছেন। তাই একটি কঠোর কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োজন। অর্থমন্ত্রী বাজেটে এ ধরনের একটি আইন প্রণয়নের কথাই ঘোষণা করেছেন। একথা ঠিক যে কয়েকটি রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে আইন প্রণয়নও করেছে এবং সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের আইনটির নাম 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রোটেকশন অব ইন্টারেস্ট অব ডিপোজিটার্স ইন ফাইন্যানশিয়াল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট—২০১৩'। কিন্তু যে সব ভুয়ো সংস্থা একাধিক রাজ্যে তাদের বেআইনি কারবারের জাল ছড়িয়েছে

সারণি-১
বাজেট স্টেটমেন্ট

(কোটি টাকায়)

	২০১৪-১৫ (প্রকৃত)	২০১৫-১৬ (বাজেট)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত বাজেট)	২০১৬-১৭ (বাজেট)
রাজস্বখাতে আয়	১১,০১,৪৭২	১১,৪১,৫৭৫	১২,০৬,০৮৪	১৩,৭৭,০২২
মূলধনিখাতে আয়	৫,৬২,২০১	৬,৩৫,৯০২	৫,৭৯,৩০৭	৬,০১,০৩৮
মোট আয়	**১৬,৬৩,৬৭৩**	**১৭,৭৭,৪৭৭**	**১৭,৮৫,৩৯১**	**১৯,৭৮,০৬০**
পরিকল্পনা-বহির্ভূতখাতে খরচ	১২,০১,০২৯	১৩,১২,২০০	১৩,০৮,১৯৪	১৪,২৮,০৫০
পরিকল্পনাখাতে খরচ	৪,৬২,৬৪৪	৪,৬৫,২৭৭	৪,৭৭,১৯৭	৫,৫০,০১০
মোট খরচ	**১৬,৬৩,৬৭৩**	**১৭,৭৭,৪৭৭**	**১৭,৮৫,৩৯১**	**১৯,৭৮,০৬০**
রাজস্ব ঘাটতি	৩,৬৫,৫১৯	৩,৯৪,৪৭২	৩,৪১,৫৮৯	৩,৫৪,০১৫
কার্যকর রাজস্ব ঘাটতি	২,৩৪,৭৫৯	২,৬৮,০০০	২,০৯,৫৮৫	১,৮৭,১৭৫
রাজকোষ ঘাটতি	৫,১০,৭২৫	৫,৫৫,৬৪৯	৫,৩৫,০৯০	৫,৩৩,৯০৪
প্রাথমিক ঘাটতি	১,০৮,২৮১	৯৯,৫০৪	৯২,৪৬৯	৪১,২৩৪

সূত্র : বাজেট ডকুমেন্ট

রাজ্য আইনে অন্য রাজ্যের কারবারের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র কেন্দ্রীয় আইনেই এদের শায়েস্তা করা সম্ভব।

পরিশিষ্ট

অর্থমন্ত্রী বাজেটে কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, আবাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রাহক পরিষেবা বাড়াতে সারা দেশজুড়ে প্রচুর সংখ্যক এটিএম স্থাপনের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এটিএম পরিষেবা বাড়াতে পোস্ট অফিসগুলিতে মিনি এটিএম বসানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন এবং এই কাজে তিনি তিন বছরের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। এছাড়া গরিব মানুষকে বেআইনি লগ্নি সংস্থার হাত থেকে বাঁচাতে একটি নতুন কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের কথা বলেছেন। দেশের অর্থনীতিকে উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে ব্যাংকগুলি যাতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণ দিতে পরাঙ্মুখ না হয় সেজন্য সরকারি ব্যাংকগুলির মূলধন বাড়াতে অর্থ বরাদ্দ করেছেন। অনুৎপাদক ঋণের ভার কমাতে বর্তমান আইনের সংস্কারের এবং সেই সঙ্গে নতুন আইন প্রণয়নের কথা বলেছেন। এভাবেই অর্থমন্ত্রী সামাজিক ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করেছেন।

একই সঙ্গে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে সংস্কারের ওপরও অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্কারের অন্যতম দিকটি হল ব্যাংকের পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্কার। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ইন্দ্রধনুস' প্রকল্পের কথা বলেছেন। প্রকল্পটি ঘোষণা করা হয় ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে। সরকারি ব্যাংকের পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে সেগুলিকে চাঙ্গা করে তুলতেই এই প্রকল্প। ইন্দ্রধনু বা রামধনুর সাতটি রঙের মতো এই প্রকল্পে সাতদফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলি হল উচ্চ পদে নিয়োগ, ব্যাংক বোর্ড ব্যুরো গঠন মূলধনি সহায়তা, অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ কমানো, সশক্তিকরণ, দায় নির্ধারণ এবং সুশাসন। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন ইন্দ্রধনুস রূপায়ণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বাজেট পেশের দুদিন আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রাক্তন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বিনোদ রাইকে ব্যাংক বোর্ড ব্যুরোর প্রথম চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংক বোর্ড ব্যুরোর কাজের মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যাংকের সর্বোচ্চ পদাধিকারীদের নির্বাচিত করা, মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতির সন্ধান করা প্রভৃতি। ব্যাংক বোর্ড ব্যুরোর কাজ শুরু হবে ১ এপ্রিল ২০১৬ থেকে এবং এর ফলে সরকারি ব্যাংকের উচ্চতম পদাধিকারীদের নিয়োগের জন্য বর্তমানে যে নিয়োগ পর্ষদ রয়েছে সেটি আর কার্যকর থাকবে না।

রিজার্ভ ব্যাংকের সংস্কারের ওপরও অর্থমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আরবিআই আইন ১৯৩৪ সংশোধনের কথা বলেছেন। এর ফলে সুদ নীতির বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের একচেটিয়া ক্ষমতা কমে আসবে। সুদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব বর্তাবে একটি বিধিবদ্ধ কমিটির ওপর। অর্থাৎ বাজেটে একদিকে যেমন সামাজিক ব্যাংকিং-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সংস্কারের কাজও এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা রয়েছে।❑

[লেখক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার। ব্যাংক আধিকারিক হিসেবে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি 'ইউকো অন্ত্রপ্রেনরশিপ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' (বর্তমান নাম RSETI)-র প্রধান প্রশিক্ষক ও SSI-র আওতাধীন 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিস'-এর পরামর্শদাতা ছিলেন।]

দেশের আর্থিক শৃঙ্খলার হালহকিকত

রাজকোষ ঘাটতিতে লাগাম পরিয়ে অর্থনীতির বিকাশ নিশ্চিত করার ওপরই নির্ভর করে কোনও সরকারের আর্থিক নীতির সাফল্য। রাজকোষ ঘাটতিকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রেখে দেশে আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রণয়ন করা হয়েছে FRBM আইন। কিন্তু আইনের শর্তগুলি কতটা মেনে চলা হচ্ছে? ভরতুকি ব্যবস্থার কাটছাঁট ছাড়া ঘাটতি মোকাবিলায় কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ কি আদৌ নেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য স্তরে? বিশ্লেষণ করছেন **বিভি মধুসূদন রাও।**

বাজেট ঘাটতি : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

কোনও একটি আর্থিক বছরে সরকারের মোট আয় ও ব্যয়ের ফারাক থেকে বাজেট ঘাটতির উদ্ভব। অর্থাৎ সরকারের মোট আয়ের চেয়ে মোট ব্যয় বেশি হলেই দেখা দেবে বাজেট ঘাটতি। আগামী বছরের জন্য কোনও ঘাটতির পূর্বাভাস থাকলে তাকে বলা হবে প্রত্যাশিত ঘাটতি। অন্যদিকে, মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যকেই বলে রাজকোষ ঘাটতি। এখানে মোট আয়ের মধ্যে ঋণবাবদ আয়কেও ধরা হয়। এই ঘাটতিকে মোট রাজকোষ ঘাটতি বা গ্রস ফিসক্যাল ডেফিসিটও বলা হয়। সরকারের মোট রাজস্ব ব্যয় যখন মোট রাজস্ববাবদ আয়কে ছাড়িয়ে যায় তখন দেখা দেয় রাজস্ব ঘাটতি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির ঘাটতিকে একসঙ্গে বলা হয় সম্মিলিত রাজকোষ ঘাটতি (কমবাইন্ড ফিসক্যাল ডেফিসিট)।

বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস প্রথম ঘাটতি পূরণ বা ঘাটতি বাজেটের ধারণা প্রচার করেন। মন্দার সময়ে ঘাটতি পূরণ বা ডেফিসিট ফিনান্সিং-এর পক্ষে জোরদার সওয়াল করেন তিনি। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'দ্য জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি' গ্রন্থে তিনি আর্থিক বিকাশ ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে ঘাটতি পূরণের প্রয়োজনীয়তাগুলি তুলে ধরেন। এর আগে প্রচলিত ধারণা ছিল যে অর্থনীতিতে সবসময় একটা স্থির অবস্থা বজায় থাকবে। যেখানে পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনের ক্ষমতার চেয়ে উপভোক্তাদের চাহিদা সবসময় বেশি হবে। ফলে যেটুকু পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদিত হবে তা উপযুক্ত মূল্যস্তরে পৌঁছলেই ক্রেতাদের হাতে চলে যাবে। কিন্তু কেইনসের যুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত সমস্ত পণ্য ও পরিষেবার ব্যবহার না হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার অন্যতম ফল হল বর্তমানের বেকারত্ব। এর দরুন অর্থনীতির সংকোচন ঘটছে। মানুষের সঞ্চিত অর্থ পণ্য ও পরিষেবা কেনার জন্য ব্যয় না হওয়ায় আশানুরূপ হারে অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারছে না। এই অবস্থায় সরকারের তরফে ব্যয় বাড়লে সম্মিলিত চাহিদা বাড়বে এবং এর ফলে বেকারত্বের হারও কমবে। এরপর থেকে সুদের হার কমানো (আর্থিক নীতি) এবং রাজস্ব আয়ের চেয়ে সরকারি ব্যয় বাড়ানোর নীতি (রাজকোষ নীতি) অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৭ সালে মার্কিন দেশে এই নীতি গ্রহণ করেন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। পরে অনেক দেশই এই পথ অনুসরণ করে।

ঘাটতি কতটা গ্রহণযোগ্য?

এককথায় এই প্রশ্নের কোনও জবাব হয় না। ঘাটতি পূরণ বা ডেফিসিট ফিনান্সিং-এর ব্যবস্থা অবশ্য চাহিদা বাড়িয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে সাহায্য করে।

তবে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি করার সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি আদতে সরকারের ঋণের পরিমাণ বাড়ায়। আর তার জন্য উচ্চহারে সুদের বোঝাও চাপে সরকারের ওপর। এর ফলে বাজারে সুদের হার বাড়ে। বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য ঋণের জোগানও কমে। সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতির সুফল টের পেতে বহু সময় লেগে যেতে পারে— এমন যুক্তিও পেশ করেন অনেকে। এর চেয়ে কর ছাড়ের নীতি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তাঁরা। কারণ এর ফলে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের সম্ভাবনা বাড়ে। কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। সবচেয়ে বড় কথা এই নীতি প্রয়োগ করা অনেক সহজ (কর ছাড় দেওয়া এবং পরবর্তীকালে প্রয়োজনমতো করের হার বাড়ানো)।

আর্থিক সংকট

১৯৮০-র দশকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির ঋণের পরিমাণ (আন্তর্জাতিক ঋণ) তাদের পরিশোধ করার সীমা অতিক্রম করে যায়। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশগুলি মূলধনি বিনিয়োগের পরিবর্তে এই ঋণ ভোগ ব্যবহারের কাজেই লাগিয়েছিল। এর পরে মধ্যস্থতায় নামে IMF এবং বিশ্বব্যাংক। ব্যয় হ্রাস (সামাজিক ক্ষেত্রের ব্যয়ে কাটছাঁট, মজুরি হ্রাস, চাকরি ছাঁটাই, ভরতুকি হ্রাস/বন্ধ করা), ব্যবসা-বাণিজ্যের উদারীকরণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অবসান এবং দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করার মাধ্যমে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচির সুপারিশ করে এই দুটি সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে

অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি।

ভারত ও ১৯৯১ সালে অনুরূপ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। ওই সময় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মিলিত রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ১১.২৪ শতাংশে পৌঁছে যায়। বৈদেশিক লেনদেনের হিসেব (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সংকট মোকাবিলার পথ হিসাবে প্রধান প্রধান বৈদেশিক মুদ্রাগুলির সাপেক্ষে টাকার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। ১৯৯৬-৯৭ সালে সম্মিলিত রাজকোষ ঘাটতি জিডিপি-র ৮.১৭ শতাংশে নেমে এলেও ১৯৯৭ সালে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশের পর রাজকোষ ঘাটতির হার আবার জিডিপি-র ১১ শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায়। রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি ৩ শতাংশের নীচে ঘোরাফেরা করলেও মূলত রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির দরুন ১৯৯৯-২০০০ সালে তা ৪.৬ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়। রাজকোষ ঘাটতির ৬০ শতাংশের জন্যই দায়ী আবার রাজস্ব ঘাটতি। বর্ধিত হারে ভরতুকি প্রদান এবং কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেই মূলত দেখা দেয় ঘাটতি। তাই একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে বাধ্যতামূলক আইনি কাঠামো ছাড়া ঘাটতিতে লাগাম পরানোর কোনও উপায় নেই।

ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি ও রাজকোষ ঘাটতির সীমা

ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠনের জন্য ইউরোপের দেশগুলি নেদারল্যান্ডসের ম্যাসট্রিক্টে ১৯৯২ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে ইউরোপীয় দেশগুলিতে একটি অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' চালু করার কথা বলা হয়। এই অভিন্ন মুদ্রা থাকার ফলে আলাদাভাবে ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির নিজস্ব মুদ্রা ছাপা বা নিজস্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির মধ্যেই এই জোটের আর্থিক সমৃদ্ধি নির্ভর করবে। এইভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি মুদ্রাস্ফীতি, রাজকোষ ঘাটতি ও মোট ঋণ তথা এগুলির একটা নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়নভুক্ত যে তিনটি দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার সবচেয়ে কম প্রতিটি সদস্য দেশ তাদের মুদ্রাস্ফীতির হারকে উক্ত তিনটি দেশের মুদ্রাস্ফীতির গড় হারের ১.৫ শতাংশে বেঁধে রাখবে। অনুরূপভাবে, কোনও সদস্য দেশের মোট সরকারি ঋণ সে দেশের জিডিপি-র ৬০ শতাংশের বেশি হওয়া চলবে না এবং রাজকোষ ঘাটতি হার জিডিপি-র ৩ শতাংশে বেঁধে রাখতে হবে। এত সব আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি সত্ত্বেও ১৯৯৯ থেকে ২০১১—এই বারো বছরের মধ্যে বারো সদস্যের এই জোটের ১০টি সদস্য রাষ্ট্রই রাজকোষ ঘাটতি ৩ শতাংশে বেঁধে রাখার শর্ত লঙ্ঘন করেছে।

রাজকোষ ঘাটতি ও মোট ঋণের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করার ধারণাটা ভারত ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি থেকেই নিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। তবে রাজকোষ ঘাটতিকে ৩ শতাংশে বেঁধে রাখার জন্য যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার কোনও কার্যকরী ব্যাখ্যা নেই। রঙ্গরাজন ও সুব্বারাও-এর (রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন দুই গভর্নর) মতে, হিসাব অনুযায়ী ভারতের যে ১৩ শতাংশের মতো সঞ্চয় তার মধ্যে ৫ শতাংশ ও ২ শতাংশ চলে যায় যথাক্রমে কর্পোরেট ও সরকারি ক্ষেত্রে। এরপর যে ৬ শতাংশ থাকে তা হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির সম্মিলিত ঘাটতি (উভয় পক্ষে ৩ শতাংশ করে)।

আর্থিক দায়িত্ব এবং বাজেট পরিচালনা আইন ২০০৩ এবং তার প্রতিক্রিয়া

আর্থিক দায়িত্ব বেঁধে দেওয়ার জন্য একটি খসড়া আইনের সুপারিশ করতে একটি কমিটি নিয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে সরকার সংসদে পেশ করে আর্থিক দায়িত্ব এবং বাজেট পরিচালনা বিল (ফিসক্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট বিল, FRBM)। বিশদে খতিয়ে দেখা ও পরামর্শের জন্য বিলটিকে স্থায়ী সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়। এই কমিটির মতামতের ভিত্তিতে ২০০৩-এর এপ্রিলে বিলের একটি সংশোধিত সংস্করণ পেশ করা হয় লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় বিলটি উত্থাপন করা হয় ওই বছরের আগস্টে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ওই বছরই পুরোদস্তুর আইনে পরিণত হয় FRBM বিল।

এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সরকার রাজকোষ ঘাটতির মাত্রা কমিয়ে জিডিপি-র তিন শতাংশে নিয়ে আসতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে এবং সেই সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা এমনভাবে কমাবে যাতে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে রাজস্ব ঘাটতি পুরোপুরি দূর হয়। তারপর থেকে যাতে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয় সেই দিকে লক্ষ্য দেবে সরকার। ঘাটতি কমানোর জন্য বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে রাখার কথাও বলা হয়েছে এই আইনে। বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অর্থমঞ্জুরি দাবি (ডিমান্ড ফর গ্রান্টস)-সহ প্রতি আর্থিক বছরে সংসদের দুটি কক্ষে সরকারকে তিনটি বিবৃতি পেশ করতে বলেছে এই আইন। যথা—(১) মাঝারি মেয়াদের রাজকোষ সম্পর্কিত নীতির বিবৃতি, (২) রাজকোষ সংক্রান্ত নীতির পরিকল্পনা বিষয়ক বিবৃতি, (৩) সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো-বিষয়ক বিবৃতি। অর্থমন্ত্রীকে প্রতি তিন মাস অন্তর বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আয় ও ব্যয় পর্যালোচনা করে সেই প্রতিবেদন সংসদের দুটি কক্ষে পেশ করতে বলা হয়েছে এই আইনে। রাজস্ব ও রাজকোষ ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিটি রাজ্যই তাদের আইনসভায় অনুরূপ আইন পাশ করেছে।

FRBM আইন ও তার প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নিজ নিজ আইনসভায় সংশ্লিষ্ট আইন পাশের পর রাজ্যগুলি আইনে বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা তো পূরণ করেছেই এমনকী রাজস্বখাতে উদ্বৃত্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ২০০৯-১০ আর্থিক বছর। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ওই বছর আইনের লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা শিথিল করা হয়। এছাড়াও, রাজকোষ ঘাটতিকে ৩ শতাংশে বেঁধে রাখার শর্তও পূরণ করে চলেছে রাজ্যগুলি।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ সময়তেই সরকার আইনে বেঁধে দেওয়া ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি।

রাজ্যস্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ

রাজ্যস্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ বহুমুখী এবং এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার ও অর্থ কমিশন সাহায্য করে থাকে। FRBM আইন প্রণয়নের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে যে ঋণ বদল প্রকল্প বা ডেট সোয়াপ স্কিম (DSS) চালু হয়েছে তার বলে রাজ্যগুলি বাজার থেকে কম সুদে ঋণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পেয়েছে। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের এই ঋণে সুদের হার ছিল ১৩ শতাংশ। ২০০২-০৩ থেকে ২০০৪-০৫ সালের মধ্যে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ১.০৩ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করেছে। অনুরূপভাবে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ করা ঋণের সংহতিসাধন ও ত্রাণ সুবিধার (ডেট কনসোলিডেশন অ্যান্ড রিলিফ ফেসিলিটি) মূল কথা হল কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ ২০টি সমান কিস্তিতে ৭.৫ শতাংশ সুদ-সহ পরিশোধ করতে পারবে রাজ্যগুলি। ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতা পালন এবং আপৎকালীন বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব সামলানোর জন্য বেশ কয়েকটি রাজ্য কনসোলিডেটেড সিংকিং ফান্ড (CSF) এবং গ্যারান্টিজ রিডেম্পশন ফান্ড (GRF) গঠন করেছে। রাজ্যস্তরে আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরাতে বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠন, নতুন পেনশন প্রকল্পের প্রবর্তন, কর-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ইত্যাদি।

আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরাতে ২০১৬-১৭ সালে কেন্দ্রীয় স্তরে উদ্যোগ

২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের বাজেটের দিকে নজর রাখলে বোঝা যাবে যে খুব একটা পরিকল্পিত উপায়ে না হলেও কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সংহতি সাধন বা ফিসক্যাল কনসোলিডেশনের পথেই এগোচ্ছে। ২০১৫-১৬ সালে রাজকোষ ঘাটতির ৩.৯ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রা খুব সম্ভবত পূরণ করা যাবে এবং ২০১৬-১৭ সালের জন্য রাজকোষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে জিডিপি-র ৩.৫ শতাংশ। প্রতিরক্ষা কর্মীদের জন্য 'এক পদ এক পেনশন' নীতি (OROP) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন সুপারিশ অনুযায়ী বর্ধিত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা সরকারের আর্থিক দায় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজকোষ ঘাটতির মোকাবিলার জন্য এখনও পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। যে বিষয়টি আরও চিন্তাজনক সেটি হল রাজস্ব ঘাটতি। রাজকোষ ঘাটতির ৬৬ শতাংশ জুড়ে রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি (২০১৬-১৭ সালের বাজেট হিসাব)। অর্থাৎ ঋণের একটা বড় অংশই কিন্তু বিনিয়োগ বা মূলধনি সম্পদ সৃষ্টির খাতে যাচ্ছে না। FRBM-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা খতিয়ে দেখতে অর্থমন্ত্রী যেভাবে একটি কমিটি গড়ে সুনির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবর্তে একটি সীমার সুপারিশ করার কথা জানালেন তাতে FRBM-এর কার্যকারিতা নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন রয়েই যায়। এমনিতে রাজকোষ ঘাটতি নিয়ে খুব একটা চিন্তা করার কিছু নেই, কিন্তু রাজস্ব ঘাটতি সামাল দেওয়ার জন্য ক্রমাগত ঋণ করে যেতে হলে আগামী বছরগুলিতে সুদের বোঝা লাগামছাড়া হয়ে উঠবে। রাজকোষ ঘাটতির অনুপাতে ঋণ পরিশোধের হার ২০১৪-১৫ সালে যেখানে ছিল ৭৯ শতাংশ ২০১৬-১৭ সালের বাজেট হিসাবে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ শতাংশে। পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব ব্যয়ের ৩৭

সারণি-১
রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিএসডিপি) শতাংশের হিসাবে রাজস্ব ঘাটতি

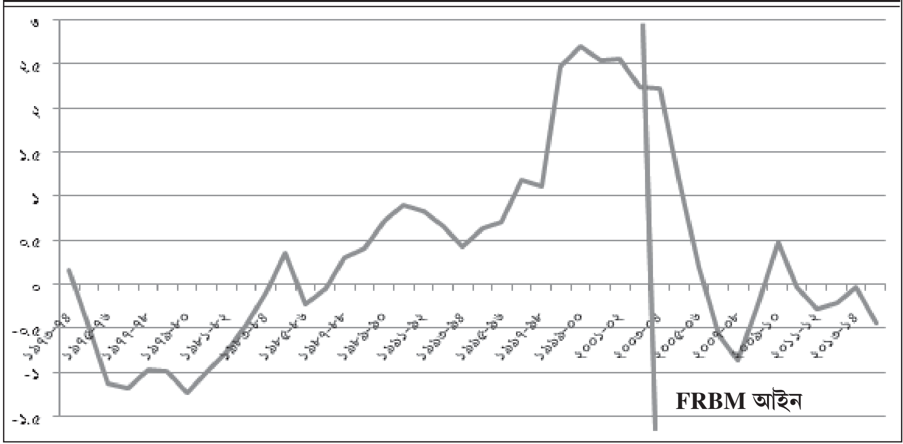

সারণি-২
রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিএসডিপি) শতাংশের হিসাবে মোট রাজকোষ ঘাটতি

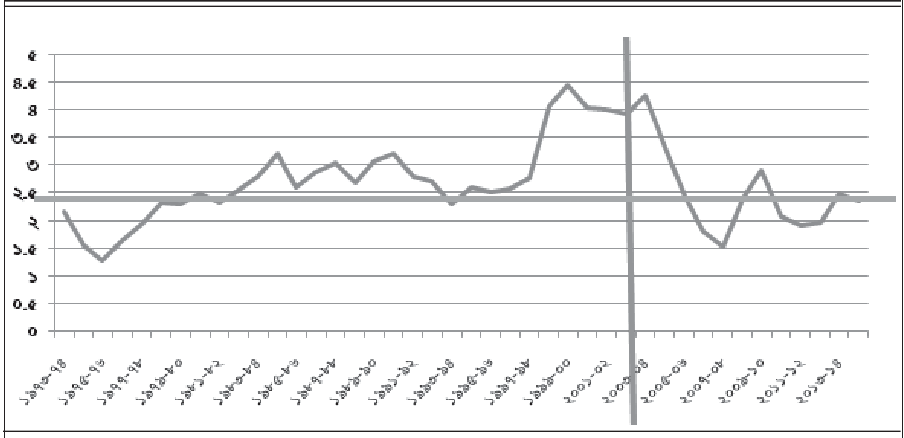

তথ্যসূত্র : রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থা বিষয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পর্যালোচনা।

শতাংশই জুড়ে রয়েছে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় যা ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ১ শতাংশ বেশি। মোট কর রাজস্বের শতাংশের হিসাবে সুদ পরিশোধের হার ২০১৪-১৫ সালে যেখানে ছিল ৪৪.৫ শতাংশ ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত হিসাবে এবং ২০১৬-১৭ সালের বাজেট হিসাবে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৭ শতাংশে।

সারণি-৩
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) শতাংশের হিসাবে রাজস্ব ঘাটতি

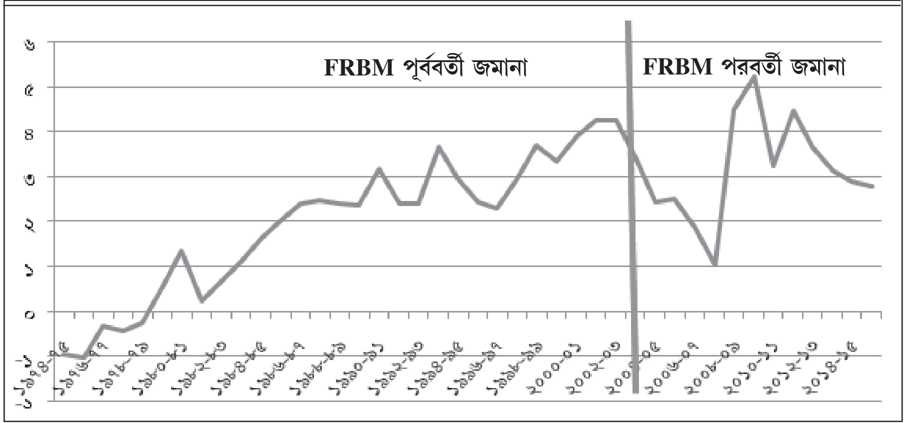

সারণি-৪
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) শতাংশের হিসাবে মোট রাজকোষ ঘাটতি

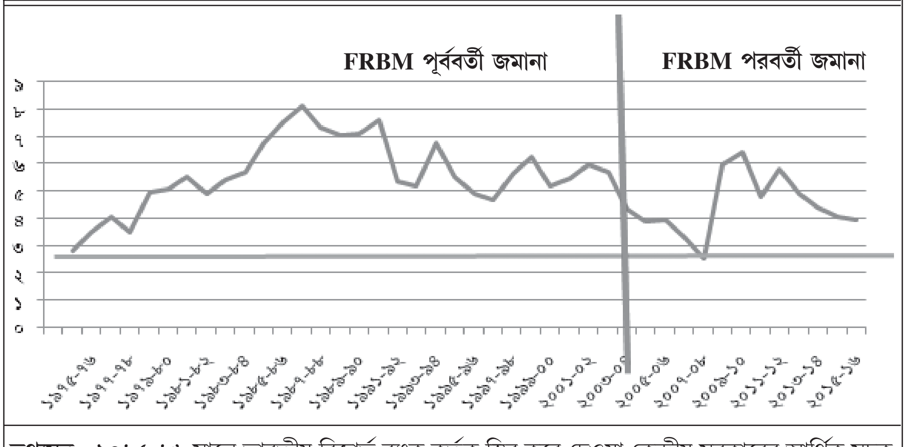

তথ্যসূত্র : ২০১৫-১৬ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক স্থির করে দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সূচক সমূহ।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ

চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করের বিভাজ্য তহবিলে (ডিভাইসিবল পুল অব ট্যাক্সেস) রাজ্যগুলির অংশ বৃদ্ধি করার পর বিভিন্ন প্রকল্পে (কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্প) কাটছাঁট করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভরতুকি বা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 'আধার'কে আইনগত বৈধতা দেওয়া সরকারের তরফে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ২০১৬-১৭ সালে কয়েকটি জেলায় সারের ভরতুকি সরাসরি কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারের বাজেটে বিভিন্ন খাতে ভরতুকির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করে গেছে। আগামী বছরগুলিতে এই ভরতুকির বহর কাটছাঁট করার পরিকল্পনা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের ধারাবাহিক মূল্য হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বালানিতে ৮-১০ গুণ উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০১৫-১৬ সালে আর্থিক সংহতি সাধনের উদ্যোগ চলেছিল। ২০১৬-১৭ সালেও খুব সম্ভবত এই একই ধারা বজায় থাকবে। এছাড়া প্রথমে ৪২,৮০০ কোটি মূল্য ধরা হলেও স্পেকট্রাম নিলাম করে ২০১৫ সালে সরকারের আয় হয়েছিল ৫৬,০০০ কোটি টাকা। এই একই খাতে ২০১৬-১৭ সালে ৯৮,৯৯৫ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে।

এছাড়া রাজস্ব আয় বাড়াতে সেস আদায়ের পন্থাও ঘাটতি মোকাবিলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সেসের আরও একটি সুবিধা হল এই যে এই খাতে সংগৃহীত অর্থের ভাগ রাজ্যগুলিকে দিতে হয় না। গাড়ির ওপর ১-৪ শতাংশ হারে পরিকাঠামো সেস, ০.৫ শতাংশ হারে কৃষি কল্যাণ সেস, প্রতি টন কয়লার ওপর ৪০০ টাকা করে দূষণহীন শক্তি সেস (এই সেসের পরিমাণ আগে অর্ধেক ছিল, এবারের বাজেটেই এই সেসের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সেসের পরিমাণ বাড়ার ফলে গ্রাহকদের বিদ্যুতের জন্য বাড়তি মাশুল দিতে হতে পারে) এবং স্বচ্ছ ভারত সেস ৩৫ হাজার কোটি টাকার জোগান দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও পদক্ষেপ ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক শৃঙ্খলা ফেরানোর স্বপ্ন দেখে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু ভরতুকি ব্যবস্থাকে কিছুটা যুক্তিসংগত করা ছাড়া এ পর্যন্ত কাজের কাজ কিন্তু বিশেষ কিছুই হয়নি। জিডিপি-তে পরিবর্তন আসতে পারে (যা হিসাব করা হয়েছিল জিডিপি-র মান তার চেয়ে কম হতে পারে)। আর এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ঘাটতিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারের তরফে কোনও প্রস্তুতি এখনও চোখে পড়ছে না। ❑

[লেখক ব্যাঙ্গালোরস্থিত সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড পলিসি স্টাডিজ (CBPS)-এর গবেষণা উপদেষ্টা।]

সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭ : শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য সংস্থান

শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের জিডিপি-র ন্যূনতম ৬ শতাংশ ব্যয় করার কথাই বারবার বলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখনও এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত ব্যয় জিডিপি-র ৪ শতাংশেরও কম। তার ওপর কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কেন্দ্র যেভাবে নিজেদের অংশীদারিত্ব কমিয়ে রাজ্যগুলির ওপর অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছে তাতে এই সমস্ত প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। এই বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্র কতটা গুরুত্ব পেল? দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেবে না তো? আলোচনা করছেন **প্রতিভা কুণ্ডু।**

আর্থিক নীতির দিক থেকে ভারতের অর্থনীতিতে ২০১৫-১৬ সালটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যগুলিকে বর্ধিত হারে কেন্দ্রীয় করের অর্থ প্রদানের বিষয়ে চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ, রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা বরাদ্দে হ্রাস এবং যোজনা কমিশনের বিলোপের মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত ভারতের সামগ্রিক আর্থিক কাঠামোর ওপর একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০১৬-১৭ সালের বাজেট শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য কোনও নতুন বার্তা বয়ে আনল কি না এবারে তা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

চিত্র-১
শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ব্যয়
(শতাংশের হিসাবে)

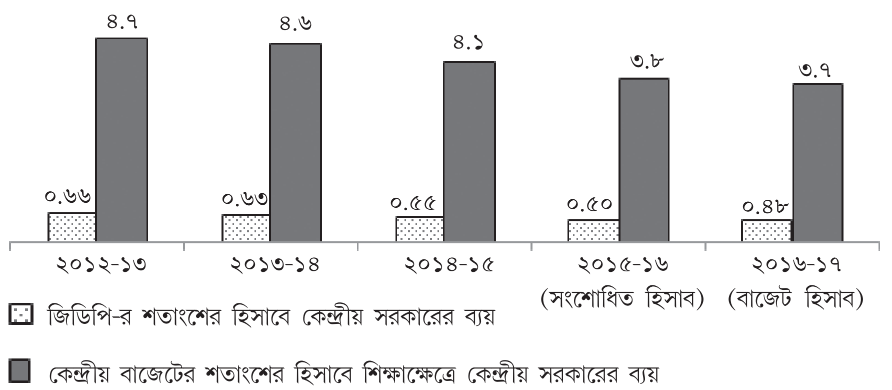

দ্রষ্টব্য : শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বলতে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রকের ব্যয়কেই বোঝায়। জিডিপি-র অঙ্ক বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী স্থির করা হয় (২০১১-১২ সিরিজ, দ্বিতীয় সংশোধিত হিসাব)।

তথ্যসূত্র : ‘কানেক্টিং দ্য ডট্‌স অ্যান অ্যানালিসিস অব ইউনিয়ন বাজেট’ CBGA

(১) বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য সংস্থান

লোকসভায় বজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী, ভারতের পালাবদল ঘটাতে পারে এমন নয়টি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। ‘সামাজিক ক্ষেত্র’ নামক তৃতীয় স্তম্ভের মধ্যে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত না করে, ‘শিক্ষা, দক্ষতা ও চাকরির সুযোগ সৃষ্টি’-কে একদম আলাদাভাবে চতুর্থ স্তম্ভ উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী।

২০১৬-১৭ (বাজেটের হিসাব অনুযায়ী) শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে জিডিপি-এর ০.৪৮ শতাংশ, ২০১৫-১৬ সালে (সংশোধিত হিসাবে) যা কি না ছিল ০.৫০ শতাংশ। বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য মোট বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের ৩.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩.৭ শতাংশ (দ্রষ্টব্য চিত্র-১)। শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের প্রায় ৭০ শতাংশই দিয়ে থাকে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক (মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক, ২০১৪)। ২০১৬-১৭ সালে (বাজেট হিসাব অনুযায়ী) এই মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭২,৩৯৪ কোটি টাকা। এর ৬০ শতাংশই নির্দিষ্ট রয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের জন্য। বাকি ৪০ শতাংশ বরাদ্দ উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জন্য। গত কয়েক বছর ধরে এই মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ অর্থ উচ্চ শিক্ষাখাতেই বেশি করে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে (দ্রষ্টব্য চিত্র-২)।

বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে বাজেটে সংস্থান

পরবর্তী বড় পদক্ষেপ হিসাবে গুণমান-সম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে জোর দিয়ে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন অর্থমন্ত্রী। তবে অদ্ভুতভাবে বাজেট প্রস্তাবে শিক্ষার অধিকার বা মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে কোনও কথাই নেই।

প্রাথমিক শিক্ষায় (প্রথম থেকে পঞ্চম-শ্রেণি) সর্বজনীন নথিভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ভারত পূরণ করলেও শুধুমাত্র নথিভুক্তির সংখ্যা দিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতির বিচার করা যায় না।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬-১৪ বছরের বয়সসীমার প্রায় ৪.৩ কোটি শিশু এখনও বিদ্যালয় শিক্ষার আওতার বাইরে (জনগণনা, ২০১১)। আর এরা ৬-১৪ বয়সসীমার মোট শিশুদের প্রায় ১৮ শতাংশ।

শুধুমাত্র নথিভুক্তিই নয়, বিগত কয়েক বছর ধরেই বিদ্যালয় শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি একটা বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে যেখানে শিক্ষার সঙ্গে সরকারি অর্থ জড়িত। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক তথা গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করার বিধান রয়েছে ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনে। কিন্তু এই আইন চালু হওয়ার পাঁচ বছর পরেও মাত্র ৮ শতাংশ বিদ্যালয় এই আইনে বেঁধে দেওয়া পরিকাঠামোগত শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ৯.৪ লক্ষ শিক্ষকের পদ এখনও শূন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রায় ৮.৩ শতাংশে মাত্র একজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন। সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে যতজন শিক্ষক/শিক্ষিকা রয়েছেন তাঁদের প্রায় ২০ শতাংশেরই কোনও প্রশিক্ষণ নেই এবং গত পাঁচ বছর ধরে প্রশিক্ষিত শিক্ষক/শিক্ষিকার অনুপাত এক জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে (DISE, ২০১৪-১৫)। শিক্ষার অধিকার আইনের সফল রূপায়ণের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষার বিভিন্ন অংশের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ বছর বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দ ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় (সংশোধিত হিসাব) মাত্র ৩.২ শতাংশ বেশি।

২.১ শিক্ষার অধিকারখাতে অর্থসংস্থান

২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই আইন রূপায়ণের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে সর্বশিক্ষা অভিযান। এই বছর সর্বশিক্ষা অভিযানখাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ২২,৫০০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় (সংশোধিত হিসাব) মাত্র ২.২ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ আসবে শিক্ষা সেস [প্রারম্ভিক শিক্ষা কোষ (PSK)] বাবদ আদায় করা অর্থ থেকে, ২৯ শতাংশ আসবে মোট বাজেট সহায়তা হিসাবে এবং বাইরে থেকে আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকল্প থেকে আসবে বাকি ৬ শতাংশ। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের একটি সাম্প্রতিক অডিট প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে শিক্ষা সেসের আদায় কম হওয়ায় ২০১৪-১৫ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) সর্বশিক্ষা অভিযানখাতে ২৭,৫৭৫ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ থেকে ৫২৫৬ কোটি টাকা ছেঁটে ফেলা হয় (CAG, ২০১৫)। তার ওপর নীতি আয়োগের কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্পগুলির যুক্তিসংগত করণবিষয়ক উপগোষ্ঠীর সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বশিক্ষা অভিযানে নিজেদের অংশীদারিত্ব ৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করেছে ৬০ শতাংশ এবং এই নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে ২০১৬-১৭ আর্থিক বছর থেকেই। এবার রাজ্যগুলি তাদের অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে পারবে কি না তার ওপরই নির্ভর করছে সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণ। এই বিষয়টি যথেষ্ট অনিশ্চিত এবং তা রীতিমতো একটা উদ্বেগের কারণ।

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণমানের বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বুনিয়াদি

চিত্র-২

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দের বণ্টন

(শতাংশের হিসাবে)

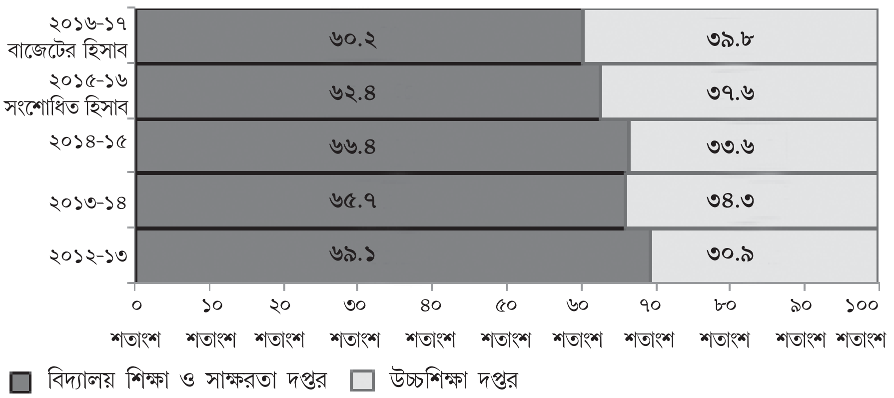

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন বছরে কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট ও মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের ব্যয় বাজেটের প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য সংকলন করেছেন লেখক।

চিত্র-৩

সেস আদায়ের মাধ্যমে সর্বশিক্ষা অভিযানে অর্থসংস্থানের ধরন

(শতাংশের হিসাবে)

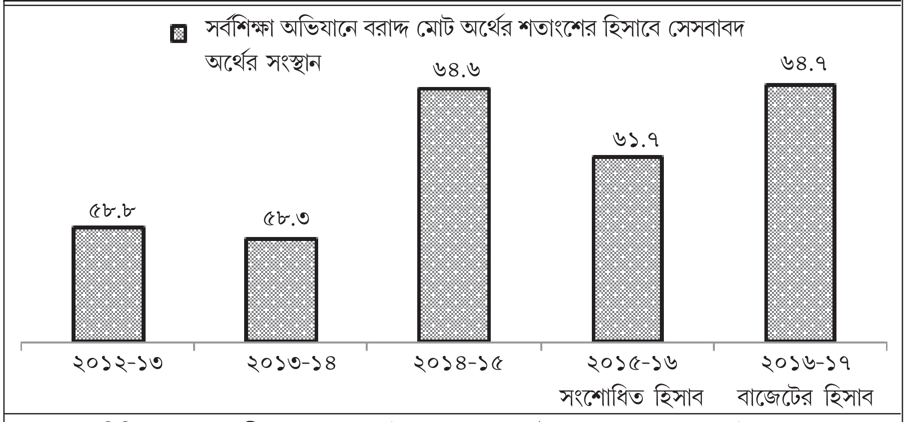

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন বছরে কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট ও মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের ব্যয় বাজেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করেছেন লেখক।

স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার স্তরের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে এই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। বুনিয়াদি স্তরে প্রায় সর্বজনীন নথিভুক্তি নিশ্চিত করা গেলেও ১৫-১৮ বছরের বয়সসীমার মাত্র ৬২ শতাংশ কিশোর-কিশোরীর নাম মাধ্যমিক স্তরে (নবম থেকে দ্বাদশশ্রেণি) নথিভুক্ত করা গেছে (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক—২০১৪) মাধ্যমিক শিক্ষার গুণমান উন্নত করার লক্ষ্যে যে 'রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান' (RMSA)-এর সূচনা সেই খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে ৩৭০০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) ১৩৫ কোটি টাকা বেশি। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানকে জাতীয় শিক্ষা মিশনের (NEM) আওতায় আনা হলেও এই অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৬০ শতাংশ। তাই, ২৫ শতাংশের পরিবর্তে RMSA-এর জন্যও রাজ্যগুলিকে এবার তাদের অংশীদারিত্ব বাড়িয়ে করতে হবে ৪০ শতাংশ।

বিদ্যালয়স্তরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উপযুক্ত শিক্ষাগতযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব থাকা সত্ত্বেও বাজেটে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বয়স্কদের শিক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ লক্ষণীয়ভাবে কমানো (২৬.৯ শতাংশ) হয়েছে। বরাদ্দ কমানো হয়েছে মাদ্রাসা/সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচিতেও (৬৪.২ শতাংশ)। মাদ্রাসাগুলির মানোন্নয়ন তথা পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের লক্ষ্যেই এই কর্মসূচিগুলি হাতে নেওয়া হয়েছিল (দ্রষ্টব্য সারণি-১)।

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা অর্থমন্ত্রী তুলে ধরেছেন তাঁর বাজেট ভাষণে। এই লক্ষ্যপূরণে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৮,৮৪০ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী) ১৩.৫ শতাংশ বেশি। এই বরাদ্দকে আলাদা করে ভাঙলে দেখা যাবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে (সাধারণ)[১] সেই অর্থে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে সামান্যই। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ বেড়েছে তা মূলত আইআইটি এবং আইআইএম-গুলিকে সহায়তা প্রদান বা নতুন আইআইটি বা আইআইএম স্থাপনের জন্য একটা বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দের কারণে।

সারণি-১
শিক্ষাক্ষেত্রে বাছাই করা প্রকল্পগুলিতে বাজেট বরাদ্দ
(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

প্রকল্প	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (বাজেটের হিসাব)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত হিসাব)	২০১৬-১৭ (বাজেটের হিসাব)
জাতীয় শিক্ষামিশন—সর্বশিক্ষা অভিযান	২৪০৯৭	২২০০০	২২০১৫	২২৫০০
জাতীয় শিক্ষামিশন—রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান	৩৩৯৮	৩৫৬৫	৩৫৬৫	৩৭০০
জাতীয় শিক্ষামিশন—শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সাক্ষর ভারত	১১৫৮	১৩৯৭	১২০৩	৮৭৯
মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে শিক্ষাপ্রদানের প্রকল্প	১১৯	৩৭৬	৩৩৬	১২০
কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন	৩২৪৩	৩২৭৮	৩২৭৮	৩৭৯৫
নবোদয় বিদ্যালয় সংগঠন	২০১৩	২০৬১	২২৮৫	২৪৭১
মিডে ডে মিল	১০৫২৩	৯২৩৬	৯২৩৬	৯৭০০

দ্রষ্টব্য : NEM—জাতীয় শিক্ষা মিশন;
'জাতীয় শিক্ষা মিশন : সাক্ষর ভারত'—এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কর্মযজ্ঞগুলি হল সাক্ষরতা অভিযান ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পুনরুজ্জীবন (অপারেশন রেস্টোরেশন), বয়স্কদের শিক্ষা ও জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষের আওতায় বয়স্কদের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/রাজ্য সহায়সম্পদ কেন্দ্রগুলিকে সহায়তাদান।
'জাতীয় শিক্ষা মিশন শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ : এই কর্মকাণ্ডের আওতায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলি হল শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধন, ভাষার শিক্ষার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ এবং বিদ্যালয় মূল্যায়ন ব্যবস্থা।
তথ্যসূত্র : 'কানেক্টিং দ্য ডটস অ্যান অ্যানালিসিস অফ ইউনিয়ন বাজেট, ২০১৬-১৭, CBGA'

সারণি-২
উচ্চশিক্ষার কয়েকটি বাছাই করা ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ
(টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্ষেত্র	২০১৫-১৬ (বাজেটের হিসাব)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত হিসাব)	২০১৬-১৭ (বাজেটের হিসাব)
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)	৯৬১৫	৯৩১৫	৪৪৯১
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অনুদান*			৬৩৫৬
শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা	২৩৭৩	২১৬৩	২২২১
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIM)	৪৯৪৯	৪৪৬৩	৫৭১৪
NEM-RUSA	১১৫৫	১০৫৫	১৩০০

দ্রষ্টব্য : ২০১৫-১৬ সালের (বাজেট হিসাবে) এবং ২০১৫-১৬ সালের (সংশোধিত হিসাবে) এই বিষয়টি UGC-এর আওতাধীন ছিল।
তথ্যসূত্র : বিভিন্ন বছরে কেন্দ্রীয় বাজেট ও মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের ব্যয় বাজেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন করেছেন লেখক।

১ এর মধ্যে রয়েছে UGC-র অংশ ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেয় আর্থিক অনুদান। যোগ্য বলে বিবেচিত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সম প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে UGC। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য আলাদাভাবে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে UGC।

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ঋণের সুদে ভরতুকি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি, হিন্দিভাষী নয় এমন রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়রে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি— এই সমস্ত বিষয়ই শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তাদানের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫-১৬ সালে (সংশোধিত হিসেব) এই খাতে ২.৭ শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কৌশলগত আর্থিক সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হিসাবে ২013 সালে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানের (RUSA) সূচনা। এই কর্মসূচিকেও জাতীয় মিশনের আওতায় আনা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে অর্থসংস্থানের পরিবর্তিত বিন্যাস অনুযায়ী নিজেদের ৬০ শতাংশ অংশীদারিত্বের হিসাবে (আগে এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অংশীদারিত্বের অনুপাত ছিল ৬৫ : ৩৫) কেন্দ্রীয় সরকার এই বাজেটে বরাদ্দ করেছে ১৩০০ কোটি টাকা, যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় (সংশোধিত হিসাব, দ্রষ্টব্য সারণি-২) ২৪৫ কোটি টাকা বেশি।

এবার যে প্রশ্নটা উঠছে সেটা হল উচ্চ শিক্ষায় অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে সেসবাবদ আদায় করা অর্থ তাহলে কীভাবে কাজে লাগানো হবে। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে সেসবাবদ আদায় করা অর্থ কী অনুপাতেই বা খরচ করা হবে? মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার অঙ্গীকার পূরণ করতে যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সেস (SHEC) চালু করা হয়েছে তা PSK-এর মতো কোনও নির্দিষ্ট তহবিলে জমা হয় না। তাছাড়া সেসবাবদ আদায় করা অর্থ ব্যয় করা হবে এমন কোনও প্রকল্প চিহ্নিতও করা হয়নি। এর ফলে একটা ধোঁয়াশা তৈরি হচ্ছে। আর অর্থের নয়-ছয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়গুলি একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিক্ষার চেয়ে দক্ষতাকে অগ্রাধিকার

স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে গেলে আমাদের দক্ষতা সৃষ্টির ওপর জোর দিতে হবে, আমাদের এক দক্ষ ভারত গড়ে তুলতে হবে।' এই লক্ষ্যপূরণে, এখনও পর্যন্ত চারটি প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। যথা, জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি মিশন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিল্পোদ্যোগের জন্য জাতীয় নীতি, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এবং দক্ষতা ঋণ প্রকল্প। অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণেও দক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বহুমুখী দক্ষতা সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় ১৫০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে ১৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকবাহিনীকে দক্ষ করে তোলা যে এ মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে ন্যূনতম শিক্ষা না থাকলে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনও সম্ভব নয়। যেখানে সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্যই এখনও পূরণ করা যায়নি, শিক্ষার ফলাফল যেখানে সন্তোষজনক নয়, সেখানে ৫-২৯ বছরের বয়সসীমায় ৪০ শতাংশ মানুষ কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আসার সুযোগ পায় না (NSS, ২০১৫) সেখানে চাকরির জন্য শুধু দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিলে কিছু অর্ধদক্ষ শ্রমিক তৈরির বেশি কাজের কাজ কিছুই হবে না। এই পরিস্থিতি কখনওই কাম্য হতে পারে না।

পরিশেষে

শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপি-র ছয় শতাংশ ব্যয় করা উচিত এমন যুক্তি মাঝে মাঝেই পেশ করা হয়। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন এমনটাই সুপারিশ করেছিল। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় পক্ষের সম্মিলিত খরচ জিডিপি-র চার শতাংশেরও কম। শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যগুলির সম্মিলিত বাজেট ব্যয়ের এইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ব্যয় কম। তার ওপর শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারিত্ব

২০১৬-১৭ সালের সাধারণ বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য প্রধান প্রধান ঘোষণা

(১) গুণমানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে ৬২টি নতুন নবোদয় বিদ্যালয়।

(২) উচ্চশিক্ষায় অর্থসংস্থানের জন্য একটি ১০০০ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে একটি 'হায়ার এডুকেশন ফিনান্সিং এজেন্সি' গড়ে তোলা হবে। বাজার থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মূলত তহবিল গড়া হবে। দান ও CSR তহবিলের অর্থও জমা হবে এখানে।

(৩) অনলাইন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ২২০০টি কলেজ, ৩০০টি বিদ্যালয়, ৫০০টি সরকারি শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ৫০টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

(৪) বিশ্বমানের শিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করতে দশটি সরকারি ও দশটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকূল নিয়ামক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

তথ্যসূত্র : বাজেট ভাষণ, কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭।

কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্পগুলিকে (CSS) যুক্তিসংগত করার বিষয়ে নীতি আয়োগের উপকমিটি এবং প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন

CSS-গুলিকে যুক্তিসংগত করার বিষয়ে নীতি আয়োগের উপকমিটির সুপারিশ মেনে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় যোজনার অন্তর্ভুক্ত ১৫০০টির বেশি প্রকল্পের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে ৩০০টি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রের প্রকল্প এবং ৩০টি কেন্দ্রীয় অনুদানপুষ্ট প্রকল্পে ভাগ করেছে। এখানে

(১) সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য চিহ্নিত শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলিকে (তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রকল্প) 'প্রধান কর্মসূচিগুলির মধ্যে প্রধান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের বিন্যাস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(২) সর্বশিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বয়স্কদের শিক্ষা-সহ শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা প্রদান, রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযানকে জাতীয় মিশনের আওতায় আনা হয়েছে। এবার থেকে এই প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের অংশীদারিত্বের অনুপাত হবে ৬০ : ৪০।

তথ্যসূত্র : নীতি আয়োগের উপকমিটির প্রতিবেদন ও বাজেট ভাষণ, কেন্দ্রীয় সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭।

ক্রমশ কমে যাওয়ায় রাজ্যগুলির ওপরই অতিরিক্ত আর্থিক দায়িত্বও আসবে। রাজ্যস্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সরকারি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত এই আর্থিক কাঠামোর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে। রাজ্যগুলি এবার তাদের বাজেটে অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রগুলিকে বেছে নিয়ে শিক্ষাখাতে কীভাবে অর্থসংস্থান করে সেটাই এখন দেখার। তবে 'শিক্ষা' যুগ্ম তালিকাভুক্ত একটি বিষয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের প্রতি কেন্দ্র, রাজ্য—উভয়পক্ষেরই সমান দায়িত্ব রয়েছে। তাই উভয়পক্ষকেই এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার যথাযথ মান বজায় রাখার ওপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।❑

[লেখক সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স অ্যাকাউন্টেবিলিটি (CBGA)-এর সঙ্গে যুক্ত।
email : protiva@cbgaindia.org]

উল্লেখপঞ্জি :

Centre for Budget and Governance Accountability (2016) : 'Connecting the dots, An Analysis of Union Budget 2016-16', March

Government of India (2015) : 'Report of the Comptroller and Auditor General of India, Accounts of the Union Government, No. 50

National University of educational Planning and Administration (2015) : 'Elementary Education State Report Cards, 2014-15', DISE Publication

Ministry of Human Resource Development (2014) : 'Analysis of budgeted expenditure on education, 2010-11 to 2012-13', Planning and Monitoring Unit, Department of Higher Education

Ministry of Human Resource Development (2014) : 'Education Statistics at a Glance', Bureau of Planning, Monitoring and Statistics

NITI Aayog (2015) : 'Report of the Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes', October

National Sample Survey Organisation (2013) : 'Status of Education and Vocational Training in India', Report No. 566, NSS 68th Round

WBCS OPTIONAL : ANTHROPOLOGY

WBCS এর অন্যতম **Optional Subjet - Anthropology**-র কোচিং করাচ্ছেন এক বিশিষ্ট গবেষক (**M.Sc** এবং **Ph.D. in Anthropology**).

কোচিং এর বিশেষত্ব :

★ সম্পূর্ণ সিলেবাস ভিত্তিক পঠন পাঠন।

★ সিলেবাস ভিত্তিক সকল Study material বাংলা এবং ইংরাজী এই দুটি ভাষায় প্রস্তুত।

★ Conceptual বিষয়গুলি অতি যত্ন সহকারে পাঠ দেওয়া হয়।

★ দূরবর্তী ছাত্র ছাত্রীদের জন্য Postal Coaching এর ব্যবস্থা।

যে কোন প্রকার পরামর্শ তথা কোচিং এর বিষয়ে জানতে

ফোন করুন : 97354 90753.

বিঃ দ্রঃ UGC NET, SET সহ UG এবং PG এর ANTHROPOLOGY HONS. এবং GENERAL এর কোচিং করানো হয়।

প্র। চ্ছ। দ। নি। ব। ন্ধ

সাধারণ মানুষ, কর্পোরেট ক্ষেত্র ও রাজ্যগুলির জন্য করের হিসাবনিকাশ

২০১৬-১৭ সালের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়, কর্পোরেট ক্ষেত্র ও রাজ্যগুলির আয়ের ক্ষেত্রে কর সংস্থানগুলির একঝলক এই নিবন্ধে। এই সংস্থানগুলির তাৎপর্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবও সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন লেখক **জয়ন্ত রায় চৌধুরী।**

২০১৬-১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এমন এক প্রয়াস, যার মধ্যে বেশকিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়। বহুপ্রতীক্ষিত কর সংস্কারের কথা এতে বলা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে আরও সংস্কারসাধনের প্রতিশ্রুতি। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে করের হার কমবে, আবার কোনও ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হবে ছাড়। তবে এবারের বাজেট প্রবাদের সেই অনিচ্ছুক সেনার মতো, যে দ্রুত সংস্কারের বুলেট দেহে নেবে না।

তবে করসংক্রান্ত সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা চমৎকার সুযোগ এই সময়ে অর্থমন্ত্রীর সামনে এসেছিল। অপরিশোধিত তেলের দাম এখন সর্বকালীন তলানিতে নামায় ভরতুকির চাপ ক্রমশ কমে চলেছে। এই সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে উৎসাহ জোগাত, বিশ্বজনীন মন্দার মধ্যেও এর চালিকাশক্তিতে সঞ্চারিত হত গতি।

গত কয়েক বছর ধরে মুদ্রাস্ফীতির হার যেভাবে বাড়ছে তার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট আয়করের হার কমালে এবং করমুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ালে তা যে শুধু বাজার ও পণ্ডিতদের প্রশংসা কুড়ত তাই নয়, প্রত্যক্ষ কর থেকে আয়ও বাড়ত বলে মনে হয়। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, অর্থমন্ত্রীর এবারের বাজেটে প্রত্যেক শ্রেণির করদাতার জন্যই কিছু না কিছু আছে।

ব্যক্তিগত আয়ের ওপর করদাতাদের জন্য ছাড়

বাজেটে ক্ষুদ্র করদাতাদের জন্য সামান্য ছাড়ের প্রস্তাব রয়েছে। যাঁরা ভাড়াবাড়িতে থাকেন অথচ বাড়িভাড়া ভাতা পান না তাদের জন্য কর ছাড়ে বৃদ্ধি এবং যাঁদের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার বেশি নয়, তাঁদের এ বাবদ ছাড়ের পরিমাণ মাসিক ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে।

প্রথমবার যাঁরা বাড়ি কিনছেন, তাঁরা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহঋণের ওপর প্রদেয় সুদে ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত করছাড় পাবেন। সম্পত্তির বাজারের যা দুঃস্থ অবস্থা, তাতে এই উদ্যোগে শুধু নতুন ক্রেতারাই নন, উপকৃত হবে রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রও। তবে এখানে দুটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। বাড়ির দাম ৫০ লক্ষের বেশি হওয়া চলবে না এবং ঋণের পরিমাণ ৩৫ লক্ষের মধ্যে হতে হবে।

বন্ধকি ঋণের সুদের ক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য বাড়ির নির্মাণকাজ শেষের সময়সীমা অথবা নিজস্ব বাড়ির নিজের মালিকানায় আনার সময়সীমা বর্তমানের ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর করা হয়েছে।

বিত্তশালীদের ওপর কর

যাঁদের আয় বছরে ১ কোটি টাকার বেশি, করসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ বছরের বাজেটে তাঁদের আয়ের ওপর সারচার্জ বা অধিভার ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। Super-Rich Tax নামে চিহ্নিত এই কর, বিশ্বজনীন কর-ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। যাঁরা বেশি আয় করেন, কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য নানা পন্থা-পদ্ধতির আশ্রয় নেবার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। একথা বোঝার পরই সরকার এখন সরাসরি তাঁদের নিশানা করছে।

বাজেটে আর একটি প্রস্তাবকে ধনীবিরোধী বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেসব ব্যক্তি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার ও সংস্থার লভ্যাংশবাবদ বার্ষিক আয় ১০ লক্ষ টাকার বেশি, তাদের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ কর বসানোর প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে।

একইভাবে ১০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয়ের ওপর উৎসমূলে ১ শতাংশ কর বসানোর প্রস্তাব রয়েছে বাজেটে। নগদ টাকায় ২ লক্ষের বেশি পণ্য ও পরিষেবা ক্রয়ের ওপরেও বসানো হয়েছে সম পরিমাণ কর। ১০-১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের গাড়িকে আদৌ বিলাসবহুল গাড়ি বলা যায় কি না, তা নিয়ে অবশ্য অনেক বিশেষজ্ঞ সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, যে দেশে বহু মানুষের দুবেলা খাবার জোটে না, যেখানে যাঁরা ১০ লক্ষ টাকা দামের গাড়ি বা নগদে ২ লক্ষ টাকার পণ্য ও পরিষেবা কিনতে পারেন, তাঁদের আয়ের ওপর সরকারের মনোযোগ পড়লে তাকে অসমীচীন বলা যায় কি?

কালো টাকার ওপর কর

কালো টাকা উদ্ধারের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সরকার, দেশের ভেতরে থাকা কালো টাকা ঘোষণার সুযোগ দিয়েছে। 'আয় ঘোষণা প্রকল্প ২০১৬' নামের এই প্রকল্পে করদাতারা তাঁদের অঘোষিত অর্থের কথা জানাতে পারেন। এর ওপর ৩০ শতাংশ কর, ৭.৫ শতাংশ সারচার্জ এবং ৭.৫ শতাংশ জরিমানা অর্থাৎ সব মিলিয়ে ৪৫ শতাংশ কর দিতে হবে।

গত বছর বিদেশে থাকা কালো টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যে এমনই একটি প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছিল।

EPFO তহবিল

২০১৬ সালের এপ্রিলের পর EPF থেকে টাকা তুললে তার একাংশের ওপর কর ধার্য করার প্রস্তাব দিয়েছিল অর্থমন্ত্রক। তবে পরে, বেতনভোগী শ্রেণির মানুষের আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। সংসদে বাজেট পেশের ৮ দিন পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী লোকসভায় এই ঘোষণা করেন। সঙ্গে তিনি এও বলেন, আসলে ঠিক কর সংগ্রহ নয়, এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য ছিল বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মরতদের পেনশন প্রকল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া।

বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, EPF থেকে টাকা তুলে তা যদি কোনও পেনশন প্রকল্পে

পুনর্লগ্নি না করা হয়, তাহলে উত্তোলিত অর্থের ৬০ শতাংশের ওপর ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষ থেকে কর দিতে হবে। প্রসঙ্গত, EPF হল দেশের বৃহত্তম সঞ্চয় তহবিল, যেখানে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের ১ এপ্রিলের আগে পর্যন্ত জমা পড়া অর্থ ও সুদ তোলার সময়ে অবশ্য কোনও কর ধার্য হবে না।

সরকার এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছিল, যাঁদের জন্য মূলত এই EPF গঠন করা হয়েছে, তাঁদের সিংহভাগের মাসিক মূল বেতনই ১৫ হাজার টাকার নীচে এবং তাঁদের উত্তোলিত অর্থের ওপরেও কোনও কর ধার্য হচ্ছে না।

সরকারের এই উদ্যোগ কিন্তু সমর্থনযোগ্য ছিল। এতে একদিকে যেমন মানুষকে পেনশন প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে সরকারের NPS পেনশন প্রকল্পের সঙ্গে EPF-এর সামঞ্জস্য আনার প্রয়াস ছিল। EPF থেকে উত্তোলিত অর্থ কোনও নিয়মিত পেনশন প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে কোনও কর দিতে হবে না বলে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে. যেসব আমলা ২০১০ সালের এপ্রিলের পর চাকরিতে ঢুকেছেন, NPS থেকে তাঁদের উত্তোলিত অর্থের ৬০ শতাংশের ওপর কিন্তু কর ধার্য করা হবে। এই পেনশন প্রকল্পে অন্য কর্মচারীরাও ইচ্ছা করলে যোগ দিতে পারেন।

কর্পোরেট করের হিসাব

বিশ্বজনীন প্রবণতার সঙ্গে সংগতি রেখে কর্পোরেট করের হার কমাবার যে প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল, এবারের বাজেটে ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলির করের হার কমাবার মধ্য দিয়ে তা পালনের সূচনা হয়েছে। ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে যেসব কোম্পানির মোট টার্নওভার ৫ কোটি টাকার কম, তাদের জন্য ২৯ শতাংশ করের প্রস্তাব রাখা হয়েছে বাজেটে। নতুন কোম্পানিগুলিকে উৎসাহ দিতে স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে করের হার হল ২৫ শতাংশ।

২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে তিন বছর পর্যন্ত স্টার্ট আপের ক্ষেত্রে কোনও কর দিতে হবে না। তবে তারা বিনিয়োগের ওপর কোনও করছাড় বা অন্য কোনও সুরক্ষার দাবিও জানাতে পারবে না।

একক ব্যক্তি এবং হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারগুলিকে স্টার্ট আপ কোম্পানি স্থাপনে উৎসাহ দিতে বাজেটে বসতবাড়ি বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থের ওপর দীর্ঘমেয়াদি মূলধনি লাভ কর তুলে দেবার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শর্তগুলি হল—ওই মূলধনি লাভ স্টার্ট আপ কোম্পানি স্থাপনে বিনিয়োগ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার নতুন কোম্পানির ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ারের মালিক হবেন এবং নতুন কোম্পানি শেয়ার মূলধনবাবদ পাওয়া অর্থ নতুন সম্পত্তি কেনার কাজে লাগাবে।

ছাড় বিলুপ্তকরণ

সরকার আগেই সতর্ক করে দিয়েছে যে, কর কাঠামোর সংস্কার করা হলে বেশকিছু ছাড়ের বিলোপসাধন করা হবে। এই সব নিয়মকানুন অনভিজ্ঞদের কাছে ভারতীয় করব্যবস্থাকে দুঃস্বপ্নময় করে রেখেছে। আর অন্যদিকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা তাঁদের মক্কেলদের জন্য মহানন্দে আইনের ফাঁক দিয়ে কর কমানোর চেষ্টায় লেগে রয়েছে। এর এক পথনির্দেশিকা এবারের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকার এলাকা ও বিনিয়োগ-ভিত্তিক করছাড় দেয়। এর মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টেলিকম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্পস্থাপন, জম্মু-কাশ্মীর-হিমাচলের মতও রাজ্যে শিল্পস্থাপন প্রভৃতি নানা মাপকাঠি রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য হল মামলার সংখ্যা কমানো এবং করপ্রক্রিয়ার সংস্কারসাধন। বর্তমানে, নানা ছাড়ের দৌলতে করের কার্যকর হার হল ২৩ শতাংশের কাছাকাছি। তবে বিধিবদ্ধ হার এর অনেক বেশি। ৩০-৩৩ শতাংশ। এই সব ছাড়ের সম্মিলিত অর্থের পরিমাণ ৬২ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

বিদেশের জন্য ন্যূনতম বিকল্প কর

ন্যূনতম বিকল্প করের সুযোগ নিয়ে বিদেশি কোম্পানিগুলি ভারতে মূলধনি লাভ করছে—এমন বিতর্ক থামাতে উদ্যোগী হয়েছে বাজেট।

২০০১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ন্যূনতম বিকল্প করের সংস্থানগুলি বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দেখতে হবে ওই কোম্পানি যে দেশের রেসিডেন্ট, তার সঙ্গে ভারতের এ সংক্রান্ত কোনও চুক্তি নেই এবং ওই সংস্থা ভারতীয় আইন অনুযায়ী Private Equity Investor নয়।

গুগ্‌ল কর

এবারের বাজেটে এক চমকপ্রদ সংযোজন হল নতুন 'সমতাবিধায়ক কর', যা সংযুক্ত যুক্তরাজ্যের 'গুগ্‌ল ট্যাক্স'-এর সমতুল। ভারতীয় রেসিডেন্টরা অনলাইনে কোনও বিদেশি সংস্থাকে বকেয়া টাকা দিলে তার ওপর ৬ শতাংশ কর ধার্য করা হবে। এর মধ্যে ই-কমার্স পরিষেবাও পড়ছে।

শাস্তি

নতুন একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে। ২০১৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে আয় কম করে দেখালে প্রদেয় করের ৫০ শতাংশ জরিমানা হবে। মিথ্যা তথ্য দিলে জরিমানা ২০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বর্তমানে জরিমানার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট আয়কর আধিকারিকের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে এবং এর পরিমাণ ১০০ থেকে ৩০০ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

রাজ্যের আয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারগুলিকে দেওয়া মোট সম্পদের হার ২০১৫-১৬-র তুলনায় ২০১৬-১৭-তে ১২ শতাংশ বাড়বে বলে বাজেটে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

তবে সেসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে এবং এই বাবদ আয় রাজ্যের সঙ্গে ভাগ করতে হয় না। এর ফলে রাজ্যগুলির আয় কমছে, যা তাদের কাছে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ।

নতুন কৃষি কল্যাণ সেস বাবদ প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা আয় হবে। পরিকাঠামো সেস থেকে আসবে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা। এগুলোর পুরোটাই পাবে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৬-১৭ সালে এমন বিভিন্ন উৎস থেকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকারও বেশি আয় হবে। এটি সমস্ত কেন্দ্রীয় কর থেকে সংগৃহীত আয়ের ১২ শতাংশ এবং এই করগুলিতে কেন্দ্রীয় ভাগের প্রায় একের পাঁচ ভাগ।❑

[লেখক বর্তমানে দ্য টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রের বাণিজ্যবিষয়ক সিনিয়র এডিটর। আড়াই দশকের সাংবাদিকতা জীবনে অর্থনৈতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ে লেখার জন্য তিনি সুপরিচিত।]

গ্রামের পরিকাঠামো ও বিদ্যুদয়ন : ২০১৬-১৭ কেন্দ্রীয় বাজেট বিশ্লেষণ

বিশ্ব অর্থনীতিতে ডামাডোল সত্ত্বেও ভারত মোটামুটি ৭ শতাংশ বিকাশহার বজায় রেখে চলেছে। ২০১৪-য় বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশহার ছিল ৩.৪ শতাংশ। তা ২০১৫-তে কমে দাঁড়ায় ৩.১ শতাংশ। বিশ্বব্যাপী মন্দার মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার পিঠ চাপড়ানিও দিয়েছে ভারতকে। মূলত অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ দেশের ভেতরকার চাহিদার উপর ভর করেই ভারতের এই সাফল্য। ২০১৪-১৫-এর মতো ২০১৫-১৬-তেও দেশে অর্থনীতির বিকাশহার ছিল ঢের ভালো। বিশ্লেষণ করছেন **হিরণ্ময় রায়, অনিল কুমার** *ও* **প্রসূম দ্বিবেদী।**

অনেকের প্রত্যাশা, সদ্য ঘোষিত এবারের বাজেট বিকাশহারে আরও জোয়ার আনতে পারে। কৃষি ও গ্রামীণ, সামাজিক, পরিকাঠামো ক্ষেত্র, কর্মসংস্থান এবং ব্যাংকের জন্য ফের পুঁজির সংস্থান—এহেন সব অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়ে বরাদ্দ বাড়ানো এই আশায় মদত জোগায়। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে লগ্নির বাধা হঠাতে সরকার অনেক আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাজেট ঘোষণায় দেখা গেল এই প্রতিশ্রুতিমাফিক বড়সড় রদবদল আনার জন্য সরকার জোরালো পদক্ষেপ করছে।

ভাবনা-চিন্তা : ২০১৬-১৭

বাজেটে আগামী বছরের জন্য দেশের ব্যয়ের ব্যাপারে এক সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এই ব্যয় থেকে লগ্নিকারী ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যরা আগামী বছরের জন্য সরকারের ধ্যানধারণার একটা আঁচ করে নিতে পারে। অর্থনীতিতে তাই বাজেটের প্রভাব যথেষ্ট। উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এবারের বাজেট ৯টি মৌল পিলার বা স্তম্ভের কথা বলেছে :

(১) কৃষি ও কৃষক কল্যাণ
(২) গ্রামে রুজিরোজগার ও পরিকাঠামোয় জোর দিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্র
(৩) স্বাস্থ্য পরিচর্যা-সহ সামাজিক ক্ষেত্র
(৪) শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
(৫) পরিকাঠামো ও লগ্নি
(৬) আর্থিক ক্ষেত্র সংস্কার
(৭) শাসন পদ্ধতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সহজ করা
(৮) রাজস্ব শৃঙ্খলা
(৯) কর সংস্কার।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রের ভূমিকা

বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামোকে যে কোনও দেশের অর্থনীতির প্রধান ভরসা ধরা হত। ৪২তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম জে ক্লিন্টন বলেছিলেন, 'সমান সুযোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অগ্রগতি নীতির দিক থেকে ঠিক এবং খাঁটি অর্থনীতিও বটে। কেননা, বৈষম্য, গরিবি ও অজ্ঞতা বিকাশের পথে বাধা দেয়। পক্ষান্তরে, শিক্ষা, পরিকাঠামো ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণায় লগ্নি বিকাশ বাড়ায়। করে আমাদের সবার জন্য আরও বেশি কাজের ব্যবস্থা ও নতুন সম্পদ সৃষ্টি।' আজকের ভারতের ক্ষেত্রে একথা খাটে। পরিকাঠামো এ দেশে শুধু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি, সেই সঙ্গে আগামী দিনে বিশেষত গ্রামাঞ্চলের জন্য এটা জরুরি। এবারের বাজেটে তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বাজেট সবচেয়ে জোর দিয়েছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে। রেল, সড়ক এবং অন্যান্য পরিকাঠামো বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক ২.২১ লক্ষ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার অর্থনীতির যে কোনও ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য চাই মৌল পরিকাঠামোর উন্নতি। সেদিক থেকেও পরিকাঠামোর ভূমিকা অপরিহার্য।

পরিকাঠামোর জন্য বাজেট

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ আসে পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে। এজন্য পাঁচ বছরে এক লক্ষ কোটি ডলার লগ্নি প্রয়োজন। এই লগ্নির অর্ধেক আসা উচিত বেসরকারি ক্ষেত্র থেকে। বাজেট তাই বেসরকারি পুঁজিপতিদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন বাজেটে কর এবং সুদবাবদ বাড়তি ছাড়ের দরুন আবাসন ক্ষেত্র চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।

সড়ক ক্ষেত্র

সড়ক ক্ষেত্র খাতে মোট বরাদ্দ ৯৭,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি কোষাগার দেবে ৫৫,০০০ কোটি টাকা। আর ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ১৫,০০০ কোটি টাকা তুলবে করমুক্ত বন্ড বিক্রির মাধ্যমে। সড়কখাতে মোট বরাদ্দের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় গ্রামের

পথঘাটের জন্য ২৭ হাজার কোটি টাকাও ধরা হয়েছে।

২০১৬-১৭-এ সরকার ১০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির লক্ষ্য ধার্য করেছে। মোটর যান আইন সংশোধনের মাধ্যমে রাস্তায় লোকজন ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ সংস্কার করা হবে। সুরক্ষা বিধি মেনে দক্ষভাবে বিভিন্ন রুটে যাত্রী পরিষেবা চালাতে উদ্যোগীদের উৎসাহ দেওয়াই হবে এই সংশোধনের উদ্দেশ্য।

পেট্রল, এলপিজি ও সিএনজিচালিত ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে পরিকাঠামো সেস বসবে মাত্র ১ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ডিজেল গাড়িতে ২.৫ শতাংশ এবং এসইউভি ও অন্য বড় গাড়িতে চাপবে ৪ শতাংশ সেস। এর ফলে উৎসাহ পাবে পেট্রল, এলপিজি, সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত গাড়ির ব্যবহার। কমবে পরিবেশদূষণ।

বিদ্যুৎ ও শক্তিক্ষেত্র

ঘরকন্না, শিল্পবাণিজ্য-সহ যাবতীয় কাজকর্মে মৌল পরিকাঠামো হচ্ছে বিদ্যুৎ ও শক্তিক্ষেত্র। কেননা, বিদ্যুৎ ও শক্তি এ দুটি সব কাজকর্মের পক্ষে অপরিহার্য। বাজেট উল্লেখ করেছে যে গত দু দশকে কয়লা তোলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। রেকর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। বিদ্যুৎ পরিবহণ লাইন বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বাধিক। এলইডি বাল্ব বিলিবণ্টনের ক্ষেত্রেও একই কথা।

গ্রামে বিদ্যুদয়ন ও নবীকরণযোগ্য শক্তি

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি যথেষ্ট সফল। গত বছরের ১ এপ্রিলের হিসেবে আর মাত্র ১৮,৫৪২টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছনো বাকি। জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এক হাজার দিনের মধ্যে বিদ্যুতের সুযোগ পাবে এসব গ্রাম। মে, ২০১৮-র মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কর্মসূচিতে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করাই সরকারের লক্ষ্য। এজন্য দীনদয়াল গ্রামীণ বিদ্যুতীকরণ যোজনা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বেড়েছে। ফলে বাড়বে শক্তির চাহিদা ও উৎপাদন। শক্তি সংস্থাগুলির উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার বা পিএলএফ বাড়বে। সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কর্মসূচি পুরোপুরি সফল করার জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা ও সংহত বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ হয়েছে ৮৫০০ কোটি টাকা।

পরমাণু বিদ্যুৎ

আগামী ১৫-২০ বছরে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্য আছে এবারের বাজেটে। দেশে থোরিয়ামের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার আছে। এই সম্পদ কাজে লাগিয়ে পরিচ্ছন্ন ও স্থায়ী বিদ্যুতের উৎস উন্নয়নের উদ্যোগে এটা এক কদম অগ্রগতি। পরমাণু বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ ৩ হাজার কোটি টাকা।

পরিচ্ছন্ন শক্তি সেস

কয়লার ওপর বসানো পরিচ্ছন্ন শক্তি সেসের নতুন নাম হয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সেস। এই সেস টনপ্রতি ২০০ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ টাকা। এর দরুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানির চল বাড়বে।

তেল ও গ্যাস

গভীর সমুদ্রের তলদেশে তেল ও গ্যাসের খোঁজে ইনসেনটিভ দেওয়া হচ্ছে। ফলে তেল ও গ্যাস উৎপাদনে আরও বেশি সংস্থা আগ্রহ দেখাবে। কমবে আমদানির উপর নির্ভরতা। দেশের তেল ও গ্যাসের দাম আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এই বাজেটের অন্যতম মূল চালক। বড় পরিকাঠামো প্রকল্প রূপায়ণে ঢের সময় লাগে। বেসরকারি লগ্নি ও বেসরকারি উদ্যোগের দক্ষতা এসব প্রকল্প দ্রুত শেষ করার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার লগ্নির ঝুঁকি ও আর্থিক বোঝা কমবে। কারণ বেসরকারি সংস্থার খরচ কম। কাজকর্মেও তারা বেশি দক্ষ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেল এখনও ইস্তক অপরিণত। সরকার এই মডেল আরও বেশি কার্যকর করার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ করছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করার লক্ষ্য

- জন উপযোগিতা (বিবাদ নিষ্পত্তি) বিল আনা হবে ২০১৬-১৭-তে।
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্পে বিশেষ সুবিধে বা অধিকার চুক্তি নিয়ে পুনরায় নীতিনির্দেশিকা জারি করা হবে।
- পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য চালু হবে নতুন ক্রেডিট রেটিং ব্যবস্থা।

(উপরের তিনটি পয়েন্ট সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব মডেল সংক্রান্ত কেলকার কমিটি রিপোর্টের অংশ) বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলির কাছে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব চুক্তির প্রস্তাবিত নীতিনির্দেশিকা বেশ ইতিবাচক।

- পরিকাঠামো ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আরও লগ্নির জন্য ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ বিত্ত নিগম, গ্রামীণ বিদ্যুৎ নিগম ও নাবার্ডকে ২০১৬-১৭-তে বাজারে বন্ড ছেড়ে ৩১,৩০০ কোটি টাকা তোলার অনুমতি দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

বিবাদ নিষ্পত্তি

এবারের বাজেটে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আইনি কাঠামো চালু করার প্রস্তাব আছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পে অভিযোগ মেটানোর ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছ ও দ্রুত ব্যবস্থার সংস্থান থাকবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি

প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির জন্য নীতি বদলানোরও পরিকল্পনা আছে। খাবার তৈরি ও গুদাম শিল্পে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির অনুমতি মিলবে। এর ফলে পুঁজিবাবদ খরচে কমবে। কমবে সরকারি লগ্নির ঝুঁকি। ভারতে টাকা ঢালতে বিদেশি পুঁজিপতিরা উৎসাহ পাবে।

কৃষি পরিকাঠামো

ভারতে প্রায় ৫০ শতাংশ কর্মীর রুজি জোটে কৃষিক্ষেত্রে (মাছ, ফলফুল চাষ ইত্যাদি-সহ)। উন্নয়নের জন্য কৃষিক্ষেত্রে যেসব পরিকাঠামো উন্নতি দরকার :

- খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুদাম ও হিমঘর
- উৎপাদনশীলতা বাড়াতে জৈব সার
- ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমাতে স্থায়ী পরিকাঠামো
- সেচ
- অনলাইনে চাষিদের ফসল সরাসরি বিক্রি ও পরিকাঠামোর সুযোগ
- সারের ভরতুকিবাবদ টাকা সরাসরি চাষিকে হস্তান্তর

গ্রামীণ ক্ষেত্রে পরিকাঠামো

ভারতে ৭২.২ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। এখনও এদের জন্য অনেক পরিকাঠামোগত সুযোগের ব্যবস্থা নেই। কারণ, এসব পরিকাঠামো গড়া ও রক্ষণাবেক্ষণ আর্থিক দিক থেকে পোষায় না। জনঘনত্ব ও সাক্ষরতা হার বেশি থাকার দরুন শহরাঞ্চলে এসব পরিকাঠামো আছে। এখন অবশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে বেশি অর্থ ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো বিকাশে গৃহীত ব্যবস্থা :

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রুরবান মিশনের আওতায় ৩০০টি রুরবান (রুরাল ও আরবান) ক্লাস্টার গঠন
- ২০১৮-র ১ মে-এর মধ্যে সব গ্রামে বিদ্যুৎ
- আগামী ৩ বছরের মধ্যে আরও ৬ কোটি পরিবারের জন্য এক নতুন ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন
- কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলি থেকে বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, খোলা জায়গায় শৌচ বন্ধ করতে পারা গ্রামগুলিকে পুরস্কার

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা রূপায়ণে অগ্রগতি আগে কখনও এত হয়নি। বরাদ্দ কম থাকায় এই প্রকল্প মার খাচ্ছিল। ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪-তে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে মাত্র ৮৮৮৫ কোটি ও ৯৮০৫ কোটি টাকা। গত ২ বছর সরকার টাকা অনেক বাড়িয়ে দেয়। ২০১৬-১৭-র জন্য এবারের বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে ১৯০০০ কোটি টাকা। এই যোজনায় রাজ্যগুলি তাদের অংশবাবদ জোগাবে ৮০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ আগামী অর্থ বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় খরচ হবে মোট ২৭০০০ কোটি টাকা। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজ ২০২১ থেকে এগিয়ে ২০১৯-এ শেষ করা। যোগাযোগের সুযোগ না থাকা বাদবাকি ৬৫০০০ গ্রামে ২.২৩ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। ২০১১-১৪ সালে গড়ে প্রতিদিন ৭৩.৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হত। এখন হচ্ছে ১০০ কিলোমিটার। রাস্তা তৈরির হার বাড়ানো হবে অনেকখানি।

পরিশেষে

এককথায়, গ্রামীণ ক্ষেত্র ও পরিকাঠামোর জন্য এবারের বাজেট খুব বড়সড় পদক্ষেপ করেছে। গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো লগ্নি উন্নয়নে সরকারের ইচ্ছাও বাজেটে স্পষ্ট। বস্তুত, সরকারি ব্যয় বাড়ানো, নয়া পরিকাঠামো তহবিল গঠন এবং আরও জোরদার, স্বচ্ছ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি প্রক্রিয়ার বুনিয়াদ গড়ার মাধ্যমে সরকার প্রধান চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় তার অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।

বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে সরকার চায় সাময়িক সুফল নয়, জনগণের টাকা খরচ হোক দীর্ঘকালীন উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে। পরিকাঠামোয় লগ্নির মাধ্যমে সরকার তাই অর্থনৈতিক বিকাশের পথে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাজেট থেকে স্পষ্ট যে শুধুমাত্র শহর নয়, গ্রামে পরিকাঠামোর উন্নতিও সরকারের লক্ষ্য। বেসরকারি পুঁজির অভাবে আগে বহু পরিকাঠামো প্রকল্প আদৌ শুরু করা যায়নি। কিছু কিছু প্রকল্প আধখেঁচড়া হয়ে পড়ে আছে। পরিকাঠামো লগ্নির জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের আরও বেশি এগিয়ে আসার দরকারও বাজেটে ঠাঁই পেয়েছে। সবদিকে লক্ষ্য রেখে এ এক সুষম বাজেট। পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যের বাজেট। এই বাজেট কৃষি, গ্রামীণ, সামাজিক ও পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগে আরও জোর দিয়ে রূপান্তরের এক কর্মসূচি তুলে ধরেছে।❑

[লেখক ড. হিরণ্ময় রায়, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, ইউপিইএস

ড. অনিল কুমার, অধ্যাপক এবং বিদ্যুৎ ও পরিকাঠামোর বিভাগীয় প্রধান

ড. প্রসুম দ্বিবেদী, সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক এবং প্রধান, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ।]

স্বাস্থ্য বাজেট ২০১৬

সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের অন্যতম মূল শর্ত হল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যথাযথ পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সাধারণ মানুষের কাছে সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার মূল্য যেমন আকাশছোঁয়া, তাতে এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগই একমাত্র ভরসা। অথচ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় গত এক দশক ধরে জিডিপি-র ১.৩ শতাংশের আশপাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবারের বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ্দ নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন **উর্মি এ গোস্বামী।**

'দেশের সাধারণ মানুষের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে, তারা পেট ভরে খেতে না পেলে, তাদের পরিচর্যার দিকে নজর না দিলে রাজনীতি কোনও কাজেই আসবে না'—স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যে উন্নয়নের অভিকেন্দ্রে অবস্থিত, এই বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে ২০১৬ সালের বাজেটে। গত এক দশকে সরকারি ব্যয়, জিডিপি-র ১.৩ শতাংশের আশপাশে স্থির থেকেছে। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দও রয়ে গেছে জিডিপি-র ০.২৫ শতাংশের কাছাকাছি। ২০১৫ সালের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে এই খাতে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপি-র ২.৫ শতাংশ করার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা এখনও অনেক দূরের পথ।

ভারতে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়, চীন ও শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই কম। ২০১৩ সালে চীনে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের হার ছিল জিডিপি-র ৫.৪ শতাংশ, মোট সরকারি ব্যয়ের হার ৩.১ শতাংশ। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভারতের মোট ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি-র ৫ শতাংশ, যা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয় এখনও ১.৩ শতাংশের বেড়া ডিঙোতে পারেনি।

বাজেটে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উল্লেখ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

প্রথমত, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের দুর্বলতা মোকাবিলায় বাজেটে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের কী কী প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে এবং তৃতীয়ত, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো অর্থাৎ চিকিৎসকের জোগান, গবেষণা, জীবাণুবাহিত রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে বাজেটে কী বলা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতগুলির প্রতিটিই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং দেশের মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্য ও ভালো থাকার ওপর এদের সার্বিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরি। অনেক সময়েই শুধুমাত্র চিকিৎসার খরচের জন্য কোনও পরিবার দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি পায় না, এমনকী চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে বহু পরিবারকে দারিদ্রের জাঁতাকলে পড়তে হয়। চিকিৎসার যথাযথ সুযোগ না পেয়ে স্বাস্থ্য আরও খারাপ হতে থাকে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে উৎপাদনশীলতা, অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং জীবনযাত্রার মানের ওপর।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় কম হবার প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এর পাশাপাশি বাতাস, জল, নিকাশির মতো সাধারণ বিষয়গুলির গুণগত মানোন্নয়নে সরকারের সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাহলে রোগের প্রকোপ কমবে, চাপ কমবে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার ওপর। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের বাজেট এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে—এতে কল্যাণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং স্বাস্থ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যখন তিনি রান্নার সময়ে 'ধোঁয়ার অভিশাপের' কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'এই ধোঁয়া এক ঘণ্টায় ৪০০টি সিগারেট পোড়ার সমান।' আগামী তিন বছরে দারিদ্রসীমার নীচে থাকা ৫ কোটি পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে LPG সংযোগ দেবার যে প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী রেখেছেন, তার অর্থবরাদ্দ স্বাস্থ্যখাতে করা না হলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে এই উদ্যোগের গুরুত্ব অপরিসীম। একইভাবে পেট্রোল ও CNG চালিত ছোট গাড়ির ওপর ১ শতাংশ, ডিজেলচালিত গাড়ির ওপর ২.৫ শতাংশ এবং বড় গাড়ি ও SUV-র ওপর ৪ শতাংশ সেস বসানোর যে প্রস্তাব অর্থমন্ত্রী করেছেন, শহুরে এলাকায় পরিবেশ দূষণ কমানোর লক্ষ্যে তাও এক গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিষয়ক পদক্ষেপ।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আর একটি প্রয়াস হল স্বচ্ছ ভারত অভিযানের বরাদ্দবৃদ্ধি। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে দেশের মাত্র ৪৬.৯ শতাংশ পরিবারে বাড়িতে শৌচাগার রয়েছে। ২০১৫-১৬ সালের ৬৫২৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এবার ৯০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ, স্বাস্থ্যবিষয়ক এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে এক্ষেত্রে শুধু শৌচাগার নির্মাণ করলেই হবে না, সেই শৌচাগার যাতে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তার ওপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ সেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে তার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণে। শৌচাগারের ব্যবহার বাড়লে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে স্বাস্থ্যের ওপরেও। জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচিতে অর্থবরাদ্দ এবারের বাজেটে সামান্য বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সালের ৪৩৭৩ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ হয়েছে ৫০০০ কোটি টাকা। পানীয় জলের গুণমান নিয়ে নানা সমস্যা আমাদের দেশে রয়েছে। বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা আরও বেশি। বেশ কিছু রাজ্যে খরা দেখা দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এমন অবস্থায় পানীয় জল কর্মসূচিতে বরাদ্দ এত সামান্য বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ।

বাতাস, জল ও নিকাশি ব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটিয়ে রোগের প্রকোপ দূর করাই যথেষ্ট নয়। যে দেশে এত গরিব মানুষ থাকেন, সেখানে একটি যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা নীতি গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় কম হবার অর্থ হল, এই ক্ষেত্রে সিংহভাগ, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ অর্থই পরিবারগুলিকে তাদের নিজস্ব আয় ও সঞ্চয় থেকে খরচ করতে হয়। হাসপাতালে ভর্তি হলে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা বহির্ভূত নানা কারণে গড় খরচ গ্রামীণ এলাকায় ১৬,৯৫৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ২৬,৪৫৫ টাকা। হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রয়োজন হয়নি, এমন রোগীর গড় চিকিৎসা ব্যয় গ্রামে ৫০৯ টাকা, শহরে ৬৩৯ টাকা।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় কম হবার আর একটি তাৎপর্য হল, জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। ২০১৫ সালে 'ভারতে সামাজিক ভোগের প্রধান মাপকাঠিসমূহ : স্বাস্থ্য' শীর্ষক NSSO প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে এবং বহির্বিভাগের চিকিৎসায় বেসরকারি ক্ষেত্র একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। হাসপাতালের বাইরে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ভাগ মাত্র ১১.৫ শতাংশ। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে খরচ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের থেকে চারগুণ বেশি। বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি হয়ে চিকিৎসার গড় খরচ ২৫,৮৫০ টাকা। সরকারি হাসপাতালে এই খরচের গড় ৬১২০ টাকা।

খরচের এই হার থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিকিৎসাক্ষেত্রে গরিব মানুষ কতটা অসহায়। বড় ধরনের কোনও রোগ হওয়া মানেই আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। ২০১৬-র বাজেটে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে চাওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী পরিবারপিছু ১ লক্ষ টাকা বিমার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত ৩০,০০০ টাকা। স্বাস্থ্যবিমার জন্য ২০১৫-১৬ সালের সংশোধিত হিসাবে ৫৯৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০১৬-১৭য় তা বাড়িয়ে ১৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

উন্নত স্বাস্থ্যবিমা, সাধারণ মানুষ, বিশেষত প্রবীণদের চিকিৎসা পরিষেবা পেতে সাহায্য করে। ভারতের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ দারিদ্রসীমার নীচে এবং প্রান্তসীমায়, সেখানে উন্নত ও কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার কোনও বিকল্প নেই। এদের কিছু ইতিবাচক সংকেত মিলছে। জনস্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর নির্ভরশীলতা আগের থেকে সামান্য হলেও বেড়েছে। ২০০৪ সালের NSSO সমীক্ষায় মাত্র ২২ শতাংশ মানুষ জনস্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পেতেন। ২০১৫ সালের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই হার বেড়ে ২৮.৩ শতাংশ হয়েছে। তবে এই বৃদ্ধি নিয়ে খুব একটা উৎসাহিত হবার কারণ নেই। দশ বছরে বৃদ্ধির গতি নেহাতই তুচ্ছ এবং এর মধ্যে জনসংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে।

২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের প্রথম আট মাসে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রকৃত সরকারি ব্যয় ৯ শতাংশ বেড়েছে। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ২০১২-১৩ সালে ছিল ২৭,৮৮৪ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬য় তা হল ৩৪,৯৫৭ কোটি টাকা। বর্তমান বাজেটে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯,৫৩৩ কোটি টাকায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO জানাচ্ছে, ভারতে প্রতি বছর ৫২ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ২০২১ সালের মধ্যে শহরাঞ্চলে মৃত্যুর হার ৪২ শতাংশ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশে প্রতি মিনিটে একজন হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে, ৪০ বছরের নীচে প্রতি ৬ জনের ১ জন ক্যান্সার ও হৃদযন্ত্রঘটিত রোগে আক্রান্ত। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সময়সীমায় ভারতে ছোঁয়াচে নয়, এমন রোগের অর্থনৈতিক বোঝা দাঁড়াবে ৬.২ ট্রিলিয়ন ডলারে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ের হিসাবে ভারতের স্থান বিশ্বে ১৫৭তম। এর পরিমাণ মাত্র ৪৪ ডলার PPP। স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা প্রসারিত করতে পারলে বহু মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রগুলির আমূল পরিবর্তন

ঘটাতে হবে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত পেশাদার এবং পর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা করতেই হবে।

সাধারণ মানুষ যাতে সহজে ওষুধ পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালে জন ঔষধি প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু এই প্রকল্প ভালোভাবে চালানো হচ্ছে না। এ পর্যন্ত মাত্র ১৬৪টি জন-ঔষধি দোকান খোলা হয়েছে। তার মধ্যেও আবার চালু রয়েছে মাত্র ৮৭টি। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৩০০০টি জন-ঔষধি দোকান খোলা হবে। এজন্য বাজেটে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত বছর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই পদক্ষেপ অবশ্যই স্বাগত। কিন্তু সরকারকে মূল সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে। মূল সমস্যা হল, ডাক্তাররা জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লেখেন না এবং জেনেরিক নামে অনেক জায়গায় ওষুধও পাওয়া যায় না।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যা আরও বড় এক সমস্যা। প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয় ঠিকই, কিন্তু সেগুলিতে পরিষেবা পাওয়া যায় না। দক্ষ পেশাদার, চিকিৎসক, নার্স, অ্যানাস্থেটিস্ট—সবেরই জোগান সীমিত। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এদের দেখা মেলা ভার। এর ফলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নড়বড়ে হয়ে পড়ে।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম, জম্মু ও কাশ্মীর এবং তামিলনাড়ু—দেশের এই সাতটি রাজ্যে একটা সমীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা গেছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দক্ষ পেশাদারের অভাবে অনেক জায়গায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত পদ শূন্য। ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে শল্য চিকিৎসকের ৮৩ শতাংশ পদ শূন্য, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত পদগুলির মাত্র ২৭ শতাংশ নিয়োগ হয়েছে। একটা বিষয় স্পষ্ট। ভারতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে দক্ষ ও কার্যকর করে তুলে সবার নাগালের মধ্যে আনতে হলে সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করতেই হবে। না হলে সাধারণ মানুষকে ব্যয়বহুল বিকল্পের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে, যা ভারতের মতো দেশে সম্ভব নয়। সরকারি তরফে কেবল একটা বিমার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট হতে পারে না। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ এবারের বাজেটে সামান্য বেড়েছে। ২০১৫-১৬ সালের ১৯১২২ কোটি থেকে বেড়ে এবার বরাদ্দ হয়েছে ২০০৩৭ কোটি টাকা। সরকারকে এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে শূন্যপদ পূরণ, অ্যাম্বুলেন্স, মোবাইল ইউনিট সহ পরিকাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অবিলম্বে তৎপর হওয়া দরকার।

২০২৫ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই কর্মক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায়শই ভারতীয় নেতারা একে ভারতের 'জনগোষ্ঠীগত সুবিধা' বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু সত্যিই এই সুবিধা নিতে গেলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিকাশি ব্যবস্থার মতো সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে। ২০১৬-র বাজেটে এই লক্ষ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজন বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার।

সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য ব্যয়কে সম্পদের বহির্গমন বলে মনে করেন অনেকে। কিন্তু বোঝা দরকার অর্থনীতির বিকাশ, উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা প্রভৃতি বাড়ানোর জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় একান্ত আবশ্যক। একটা অংশ আবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের পক্ষে। তাঁরাও এ বাবদ সরকারি ব্যয় সংকোচনের সওয়াল করেন। তাঁদের কথায় কান দিলে সেটা খুব বড় ভুল হবে। স্বাস্থ্যে বিনিয়োগই বিকাশের চাবিকাঠি।

প্রায় ১৭০ বছর আগে রুশ চিন্তাবিদ আলেকজান্ডার হারজেন প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'প্রগতিই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে আমরা কাদের জন্য কাজ করছি? আজ যারা জীবিত, তারা কি আগামী দিনের মানুষের নাচাকোঁদার জন্য মঞ্চ বানাতে বলিপ্রদত্ত? নাকি তারা এক ধরনের ক্রীতদাস, যারা হাঁটু অবধি কাদা মেখে একটা নৌকাকে টেনে আনছে, যার ওপর রহস্যজনক কিছু সম্পদে খোদাই করা রয়েছে 'ভবিষ্যতের প্রগতি' শব্দটা?' হারজেনের এই প্রশ্ন আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ❑

[লেখিক দ্য ইকনমিক টাইমসের সহকারী সম্পাদক।]

কেন্দ্রীয় বাজেট কি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারবে

ব্যাংকিং ক্ষেত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা, বিশেষত ক্রমাগত বেড়ে চলা অনুৎপাদক সম্পদ দেশীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশের পথে এক বড় প্রতিবন্ধকতা। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এর প্রতিকারে নেওয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এই নিবন্ধে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন সুপারিশেরও উল্লেখ করেছেন লেখক **ড. এনআর ভানুমূর্তি** *ও* **মণীশ কুমার প্রসাদ।**

এবারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায়, ভারতীয় অর্থনীতি প্রধান যে দুটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তা তুলে ধরা হয়েছে। এর একটি হল ব্যাংকিং ক্ষেত্র, বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির দুর্বলতা এবং অপরটি কর্পোরেট ক্ষেত্র। এই দুটি খানিকটা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যাশা ছিল, ২০১৬-১৭ সালের বাজেটে বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির পুনরুজ্জীবনে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই মতো বাজেটে একাধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে সেগুলি আলোচনার আগে, সমস্যাটা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার।

সমস্যা

বিশ্বজনীন আর্থিক সংকটের পর অন্য অনেক দেশের মতোও ভারতেও বিভিন্ন পুনরুজ্জীবন প্যাকেজের ঘোষণা করা হয়। এগুলি অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করলেও ভারতকে মুখোমুখি হতে হয় বিপুল আর্থিক ঘাটতির। মোট আর্থিক ঘাটতির হার দুটি অঙ্কে পৌঁছে যায়। এর প্রভাবে জিডিপি-র হার কমে, মুদ্রাস্ফীতি মাথাচাড়া দেয়, চলতি খাতেও দেয় বিপুল ঘাটতি। এর জেরে দীর্ঘ সময় ধরে সুদের হার চড়া রাখতে হয়। এই সব উপাদানের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে অর্থনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে, ভবিষ্যৎ বিকাশ নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এক প্রধান স্তম্ভ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও সম্পত্তি ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমও এই ব্যাংকিং ক্ষেত্র। ফলে সম্পত্তি ক্ষেত্রের অস্থিরতার প্রভাব ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ওপরেও পড়ে। দুটিভাবে এটি হয়। একটি হল সরকারের বেশি ঋণের জেরে বিপুল রাজকোষ ঘাটতি এবং অন্যটি সুদের উচ্চহার, যা কর্পোরেট ক্ষেত্রের মুনাফা কমিয়ে দেয়। এর ফলে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির লিভারেজ অনুপাত ক্রমশ কমছে। রিজার্ভ ব্যাংক এক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ এবং Basel-III নিয়মাবলি ৩ শতাংশের সুপারিশ করা সত্ত্বেও অনেক ব্যাংকের লিভারেজ অনুপাতই এর অনেক নীচে। নিয়ম লঙ্ঘনের মাশুল হল অনুৎপাদক সম্পদ বা Non-Performing Asset—NPA-র পরিমাণ বৃদ্ধি।

নীচের রেখাচিত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে NPA-র প্রবণতা দেখানো হয়েছে। উচ্চ বিকাশের সময়ে দুই ধরনের ব্যাংকেই NPA, ৩ শতাংশের নীচে ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির NPA, বেসরকারি ব্যাংকগুলির তুলনায় অন্তত ১ শতাংশ পয়েন্ট

মোট ঋণের সাপেক্ষে মোট NPA

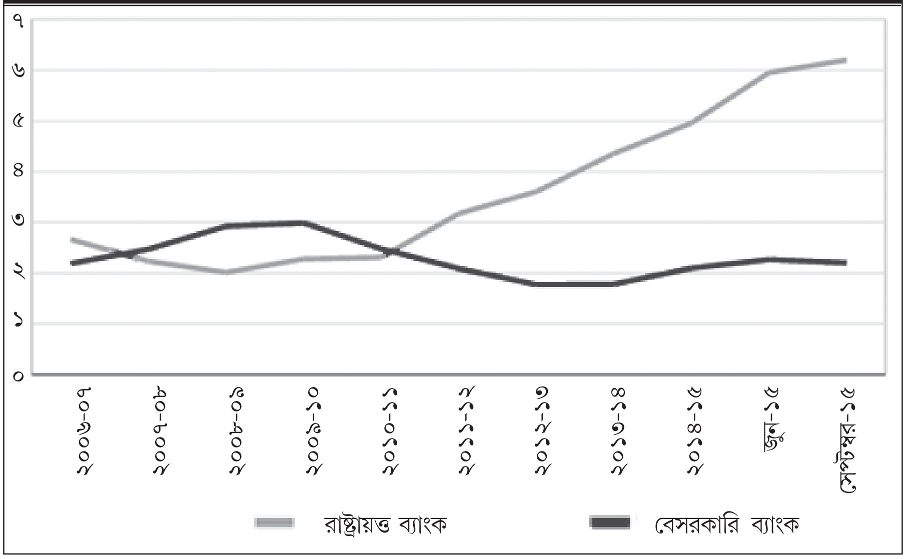

নীচে থাকত। সংকটের আগেকার সময়ের কম রাজকোষ ঘাটতি এবং সরকারি সঞ্চয় সম্ভবত এর কারণ। সংকটপরবর্তী সময়ে ঠিক উলটো প্রবণতা দেখা যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিতে NPA উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে। বেসরকারি ব্যাংকগুলির NPA নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়। এর থেকে বোঝা যায়, আর্থিক মাপকাঠিগুলি দুর্বল হওয়ার অর্থ অর্থনৈতিক বাজারেও তার প্রতিফলন ঘটা। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ৬ শতাংশের সামান্য বেশি, যা বেশ উদ্বেগের। এর ছায়া পড়ছে ব্যাংকগুলির মুনাফার ওপরেও। ২০১৬-১৭ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, অন্তত ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে।

নেট NPA, পুনর্গঠিত সম্পত্তি এবং মুছে দেওয়া ঋণের ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা দেখা যাবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে মোট NPA, ইতিমধ্যেই পুনর্গঠিত সম্পত্তি এবং মুছে দেওয়া ঋণের মোট হার, মোট ঋণদানের ১৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। বেসরকারি ব্যাংকে এই হার ৬.৭ শতাংশ।

NPA এতটা বাড়ার পিছনে কোন ক্ষেত্রগুলি রয়েছে, তাও জানা দরকার। সারণি-২-তে এটি স্পষ্ট হবে। সাধারণ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে NPA-তে কৃষিক্ষেত্রের অবদান সবথেকে কম। ২০১৫-১৬ সালে দেশে পরপর দুবার খরার জন্য কৃষিঋণের পরিমাণ বাড়লেও এইক্ষেত্রে NPA-র হার ক্রমশই কমছে। কিন্তু শিল্পক্ষেত্র, বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে NPA-র হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।

সারণি-১
রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলিতে সম্পত্তির গুণমানের প্রবণতা

	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক				বেসরকারি ব্যাংক			
	মার্চ ১৩	মার্চ ১৪	মার্চ ১৫	সেপ্টেম্বর ১৫	মার্চ ১৩	মার্চ ১৪	মার্চ ১৫	সেপ্টেম্বর ১৫
নেট NPA (শতাংশ)	২.০	২.৭	৩.২	৩.৬	০.৫	০.৭	০.৯	০.৯
পুনর্গঠিত সম্পত্তি (শতাংশ)	৭.২	৭.২	৮.১	৭.৯	১.৯	২.৩	২.৪	২.৪
মোট + পুনর্গঠিত সম্পত্তি (শতাংশ)	১১.০	১১.৯	১৩.৫	১৪.০	৩.৮	৪.২	৪.৬	৪.৬
মোট + পুনর্গঠিত সম্পত্তি + মুছে দেওয়া সম্পত্তি (শতাংশ)	১৩.৪	১৪.১	১৬.১	১৭.০	৫.৪	৬.৪	৬.৭	৬.৭

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংকের ওয়েবসাইট

সারণি-২
কু-সম্পত্তির ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ

	সব ব্যাংক [মোট + পুনর্গঠিত + মুছে দেওয়া সম্পত্তি (শতাংশ)]			
	মার্চ ১৩	মার্চ ১৪	মার্চ ১৫	সেপ্টেম্বর ১৫
কৃষি	৮.২	৭.৪	৭.৫	৭.৯
শিল্প (অতিক্ষুদ্র)	১০.২	১০.০	১০.৫	১২.৩
শিল্প (ক্ষুদ্র)	১৩.২	১৩.৩	১৪.৮	১৬.৮
শিল্প (মাঝারি)	২০.২	২৩.৬	২৭.০	৩১.৫
শিল্প (বৃহৎ)	১৬.৩	১৯.০	২৩.০	২৩.৭

সূত্র : রিজার্ভ ব্যাংকের ওয়েবসাইট

প্রভাব

ব্যাংকিং ক্ষেত্রের এই NPA-র প্রভাব সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর ঋণ এবং সুদের হারের দিক থেকে খোঁজা যেতে পারে। সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতি বেঁধে রাখার নমনীয় লক্ষ্যমাত্রা নেওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম তলানিতে পৌঁছনোয় অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির হার ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এর ফলে সুদের হার কমানোর প্রত্যাশা জাগছে বিভিন্নমহলে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর থেকে দফায় দফায় পরিকল্পিতভাবে রিজার্ভ ব্যাংক সুদের হার ১২৫ বেসিস পয়েন্ট কমিয়েছে। কিন্তু ব্যাংকগুলি (রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয়েই) তাদের সুদের হার কমিয়েছে মাত্র ৪০ বেসিস পয়েন্ট। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, রেপো রেট কমলেই যে বিনিয়োগ চক্রের পুনরুজ্জীবন ঘটবে, এমনটা ভাবা ভুল। বর্তমানে ব্যাংকগুলির প্রয়োজন আরও মূলধন। কিন্তু সুদের হার কমার সরাসরি প্রভাব বিনিয়োগের ওপর না পড়ায় রিজার্ভ ব্যাংক সুদ আরও কমানোর বিষয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। এর জেরে বেসরকারি বিনিয়োগ ও বিকাশ খানিকটা থমকে।

NPA ক্রমশ বেড়ে চলার বিপদ নিয়ে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার IMF সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে সতর্ক করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'ভারতে বাইরের অর্থব্যবস্থার থেকে বিপদের আশঙ্কা এবং মুদ্রাস্ফীতির হার কমলেও বিপুল রাজকোষ ঘাটতি ম্যাক্রো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বড় চ্যালেঞ্জ। মুদ্রাস্ফীতি এবং এর আশঙ্কাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে আর্থিক নীতি সুদৃঢ় রাখতে হবে। আর্থিক শৃঙ্খলাসাধনের ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি কর কাঠামোর সার্বিক সংস্কার এবং ভরতুকি হ্রাসের বিষয়ে একান্ত মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কর্পোরেট আর্থিক ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সম্পদের গুণমানের ওপর সতর্ক নজর না রাখলে আর্থিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।' (আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, ২০১৬)

কেন্দ্রীয় বাজেট কী করল?

ব্যাংকগুলির মূলধনের প্রয়োজন মেটাতে বাজেটে এ বাবদ ২৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আরও অর্থের প্রয়োজন হলে তার সংস্থানও যে করা হবে, সরকার সেই ইঙ্গিত দিয়েছে। প্রত্যক্ষ এই ব্যবস্থা ছাড়া পরোক্ষ যে পদক্ষেপগুলি বাজেটে নেওয়া হয়েছে তা হল :

- ✶ আর্থিক সংস্থাগুলির জন্য একটি সংহত কোড
- ✶ SARFAESI আইন, ২০০২-এ সংশোধন। এর ফলে একজন স্পনসর এখন ARC-র ১০০ শতাংশ পর্যন্ত মালিকানার অধিকারী হতে পারবেন
- ✶ ঋণ আদায় ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের মাধ্যমে অনলাইনেও এগুলি কার্যকর করে তোলা
- ✶ বেআইনি আমানত সংগ্রহকারী প্রকল্পগুলির মোকাবিলায় সুসংহত কেন্দ্রীয় আইন
- ✶ সিকিউরিটি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালের সদস্য ও বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি
- ✶ প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ১,৮০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ।

এই ব্যবস্থাগুলি সম্পত্তি ক্ষেত্রে ঋণের জোগান বাড়াতে সহায়ক হলেও এগুলি কি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সব দুর্বলতা দূর করার পক্ষে যথেষ্ট? আমাদের মনে হয়, ব্যাংকিং ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করে তুলতে আরও অনেক কিছু করার দরকার। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করতে পি জে নায়েক কমিটির সুপারিশগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার। এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি হল :

- ✶ ১৯৭০ ও ১৯৮০-র ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ আইন, SBI আইন এবং SBI (Subsidiary Banks) আইনের বিলোপসাধন
- ✶ সব ব্যাংককে কোম্পানি আইনের আওতায় এনে সরকারি মালিকানার অংশ ব্যাংক বিনিয়োগ কোম্পানি নামে একটি নতুন সংস্থায় হস্তান্তর করা।
- ✶ ব্যাংক বোর্ডস ব্যুরোর সাহায্যে সর্বক্ষণের ডিরেক্টর নিয়োগ
- ✶ সরকারি মালিকানার অংশ ৫০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনা
- ✶ তরুণ প্রজন্ম যাতে ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্তরে পৌঁছতে পারে সেজন্য মানবসম্পদ নীতির পরিবর্তন
- ✶ কৌশলগত ঝোঁক আরও বাড়াতে বোর্ডের উন্নয়নসাধন
- ✶ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির উন্নয়নের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

এছাড়া সম্পদ পুনর্গঠন সংস্থার ভূমিকা এবং এ সংক্রান্ত নীতিনির্দেশিকাও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সম্পত্তির সঠিক সময়ে সঠিক দামে বিক্রয়ের জন্য একটি জাতীয় সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা কোম্পানি গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে। ব্যাংকিং ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে এবং তার সমাধান খুঁজতে সরকার, রিজার্ভ ব্যাংক ও বিভিন্ন ব্যাংকের শীর্ষকর্তাদের নিয়ে বার্ষিক জ্ঞানসঙ্গম সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। বাজেটের ঠিক পরেই অনুষ্ঠিত এবারের জ্ঞানসঙ্গমে ব্যাংকের সংস্কার এবং খেলাপি ঋণ আদায়বিষয়ক আইন নিয়ে বেশকিছু সুপারিশ পাওয়া গেছে।❑

[ড. এন আর ভানুমূর্তি বর্তমানে NIPFP, নতুন দিল্লির অধ্যাপক। বিশিষ্ট এই অর্থনীতিবিদ দেশ-বিদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন, যুক্ত থেকেছেন বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গেও। গত এক দশক ধরে তিনি ইন্ডিয়ান ইকনোমেট্রিক সোসাইটির সচিব।

মণীশ কুমার প্রসাদ উন্নয়নমূলক অর্থশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর। বর্তমানে NIPFP-তে গবেষণা সহায়ক হিসাবে কর্মরত।]

উল্লেখপঞ্জি :

International Monetary Fund. (2016, February 26). Global Prospects and Policy Challenges. *G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meetings,* pp. 1-17.

Reserve Bank of India. (2014). *Report of the Committee to Review Governance of Boards of Banks in India.* Mumbai : Reserve Bank of India.

বি । শে । ষ । নি । ব । ন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী বাজেট ২০১৬-১৭

একটি পর্যালোচনা

বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তাই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে পেশ করা হল 'ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট'—তারই বিস্তারিত হিসেব-নিকেশ নিয়ে আলোচনা করছেন **উৎপল চক্রবর্তী।**

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বিগত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তী আর্থিক বিবরণী এবং সেই সঙ্গে প্রথম চার মাসের ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেট প্রস্তাব পেশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ড. অমিত মিত্র। সাধারণত নির্বাচনের বছরে সরকারি পূর্ণাঙ্গ বাজেট গৃহীত হয় না। কারণ পূর্ণাঙ্গ বাজেট হল একটি আর্থিক বছরের জন্য সরকারের আর্থিক অবস্থার সার্বিক প্রতিবেদন। এই সময় কালে কী কী ব্যয় হবে তার বিবরণ এবং সেই ব্যয়নির্বাহের বিস্তারিত হিসাব থাকে এই প্রতিবেদনে। কোন কোন খাতে এবং কীভাবে অর্থ ব্যয় হবে এবং কীভাবেই বা সেই অর্থ সংগৃহীত হবে তার বিশদ বিবরণ সংবলিত প্রতিবেদনই পূর্ণাঙ্গ বাজেট। এছাড়া পূর্ণাঙ্গ বাজেটের মধ্যে সরকারের আর্থিক নীতি, কর প্রস্তাব ইত্যাদিরও প্রতিফলন থাকে।

কিন্তু যেহেতু রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন, ফলে কোনও নীতি বা প্রস্তাব সংবলিত বাজেট এই সময় গৃহীত হয় না। কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই এই জাতীয় পরিস্থিতিতে যে বাজেট পেশ করা হয় লোকসভা কিংবা রাজ্য বিধানসভায়, সেটি 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' নামে পরিচিত। এর কারণ হল পূর্ববর্তী বাজেট অনুযায়ী বর্তমান আর্থিক বছর অর্থাৎ ২০১৫-১৬-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত সরকারের অর্থব্যয়ের অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠিত হতে ৩১ মার্চের পরও দু-তিন মাস প্রয়োজন হতে পারে এবং এই সময়কার সরকারি প্রশাসন এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থের প্রয়োজন। সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারকেই 'কনসোলিডেটেড ফান্ড' থেকে এই অর্থের সংস্থান করতে হয়। এ ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে ব্যয়নির্বাহের অনুমোদন দেবার ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রে লোকসভা এবং রাজ্যে বিধানসভার হাতে। এই কারণেই কেন্দ্র বা রাজ্য উভয় সরকারকেই পরবর্তী দু-তিন মাসের জন্য ব্যয়ের বিবরণ সংবলিত নথি প্রস্তুত করে লোকসভা কিংবা রাজ্য বিধানসভার অনুমোদন নিতে হয়। একই কারণে বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে ২০১৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লোকসভায় ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেছিলেন ভারতের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী পালনিয়াপ্পন চিদাম্বরম।

তবে অন্তর্বর্তী বাজেটের সঙ্গে ভোট অন অ্যাকাউন্টের একটা মৌলিক পার্থক্য থেকেই গেছে। কারণ ভোট অন অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র খরচের অনুমোদনই নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু সরকারের আয়ের বিস্তারিত চিত্রটি এখানে অনুপস্থিত থাকে। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী বাজেট পূর্ণাঙ্গ বাজেটের মতো না হলেও এই বাজেটে ব্যয়ের সঙ্গে আয়েরও একটা চিত্র তুলে ধরা হয়। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বাজেটে কোনও নতুন করের প্রস্তাব, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ করে প্রস্তাব পেশ করা হয় না। একইভাবে সরকারের কোনও নীতি সম্পর্কিত ঘোষণা থেকেও এই বাজেট বিরত থাকে, কারণ এই জাতীয় ঘোষণা নির্বচনী বিধির পরিপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী তাঁর এই বাজেটে রাজ্যের অর্থনীতির আশাব্যঞ্জক চিত্রই তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রারম্ভিক বাজেট বক্তৃতা থেকে দেখা যায় যে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে রাজ্যের বিকাশ এবং উন্নয়ন ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং বহুক্ষেত্রেই বাংলা প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

সার্বিক অর্থনৈতিক প্রগতি

সাম্প্রতিক GVA (Gross Value Added)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার হল ১২.০২ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ। একইভাবে GVA-এর হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও অনুসারী ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৫.৫৫ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ। শিল্পের ক্ষেত্রেও, এই বাজেট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার ১০.৫৯ শতাংশ, যেখানে সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ৭.৩ শতাংশ। আবার পরিষেবা ক্ষেত্রেও ভারতের ৯.২ শতাংশ বৃদ্ধির অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি ১৩.৯৯ শতাংশ।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী ২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬—এই পাঁচ বছরে মূলধনি ব্যয় ২,২২৫.৭৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৯৪৬.৯ কোটি টাকা। পাশাপাশি ২০১০-১১ সালের পরিকল্পিত ব্যয় ১৪,১৬৫.১৬ কোটি টাকা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৪৯,৯৫৬.৫৪ কোটি টাকা।

সামাজিক উন্নয়নের যে খতিয়ান এই বাজেটে তুলে ধরা হয়েছে সারণি-১ থেকে তার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

২০১৬-১৭ সালের বাজেট বরাদ্দ

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং তার অধীন দপ্তরগুলির সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি ২০১৬-১৭ সালের বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্যে। দেখা যাচ্ছে বর্তমান বাজেটে পরিকল্পনা খাতে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৫৭,৯০৫ কোটি টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৯৬ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের যে খতিয়ান এখানে দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যায় ২০১১ সালের মে মাস থেকে এ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৩৫ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আরও জানা যায় যে,

কর্মসংস্থানের সমস্ত লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে এই অর্থবর্ষে ২০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলিতে বাজেট বরাদ্দের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখা হল।

কৃষি ও কৃষিজ বিপণন

পশ্চিমবঙ্গে ২.৭ শতাংশ চাষযোগ্য জমির অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে এই রাজ্যের অবদান ৮ শতাংশের কিছু বেশি। কৃষিতে বিগত কয়েকটি বছরে সাফল্যের স্মারক হিসাবে এই রাজ্য ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ এই বছরগুলিতে ভারত সরকারের 'কৃষি বর্মন' পুরস্কার লাভ করেছে। বিগত পাঁচ বছরে এই রাজ্যে ৬৯ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

পাশাপাশি 'আমার ফসল আমার গোলা' এবং 'আমার ধান আমার চাতাল' এই দুটি প্রকল্পের অধীনে যথাক্রমে ১৬,৫৯১ এবং ২১,৩১০ জনকে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিগত চার বছরে শাক-সবজি, ফলমূল, আলু, পিঁয়াজ, খামারজাত দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে লেভি তুলে নেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে কৃষি এবং কৃষি বিপণন বিভাগের বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১৫০০ এবং ২৮৫ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে এই দুটি বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১,৭২৮ এবং ২৮৫.৩৫ কোটি টাকা।

খাদ্য সরবরাহ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে ২০১১-১৫ বর্ষে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণ সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সাধারণ মানুষের খাদ্যশস্য (চাল ও গম) পাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালনে উন্নত ছাউনির ব্যবহার এবং পলিহাউস নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের বরাদ্দ ছিল ২০.২ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ সালে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৮ কোটি টাকা। পাশাপাশি ২০১৫-১৬ সালের ১৩৮ কোটি টাকা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগের বরাদ্দের তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫২.৪০ কোটি টাকা।

সারণি-১

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র : ২০০৬-২০১৬

ক্ষেত্র	২০০৬-১১-এর ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০১১-১৬-এর ব্যয় (কোটি টাকায়)	বৃদ্ধির পরিমাণ
(১) গ্রামীণ উন্নয়ন	৭,৬২৪.৯৮	৩৮,২১৪.১০	৪ গুণ
(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৩,১৩৯.৮৬	১০,০৮৫.১১	৩ গুণ
(৩) সংখ্যালঘু উন্নয়ন	১,০৩১.৩৯	৫,৫২২.৪৪	৫ গুণ
(৪) কৃষি	১,১৪৫.০৪	৩,৭৪৮.০৪	৩ গুণ
(৫) নারী ও শিশু বিকাশ	৪,৬৩১.৩১	১২,৪৬৮.৮১	৩ গুণ
(৬) শিক্ষা	৮,০৯১.৬৪	২১,৮৪১.৪৭	৩ গুণ

সূত্র : বাজেট বক্তৃতা, ২০১৬-১৭

প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন

বিগত ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বনিযুক্তি এবং স্বনির্ভরতার উপর। পশ্চিমবঙ্গের ৩৪১টি ব্লকে 'বিশেষ গো সম্পদ' অভিযান-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালের ৪৫০ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে এই বিভাগের জন্য ৪৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মৎস্য চাষ উন্নয়ন

মৎস্য চাষে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এবং উপকূলীয় ধীবরদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষায় স্বনিযুক্তি ও আয়বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্পে মীন বিতরণ ও জলাধার সংরক্ষণের উপর। ২০১৫-১৬ সালের ২১৮.১০ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের জন্য এই ক্ষেত্রে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের রূপায়ণের পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'নির্মল বাংলা মিশন' কর্মসূচিতে 'মুক্ত শৌচ'-হীন জেলা গড়ে তোলার উপর। ২০১৫-১৬ সালের ৮,৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় এই বিভাগের জন্য ২০১৬-১৭ বছরে বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে ১০,৬৫২.৮৬ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

বিগত ৫ বছরে এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ মাতৃত্ব ও শিশু সুরক্ষার উপর। বর্তমানে সমস্ত হাসপাতাল থেকে গ্রাহক পরিষেবা মূল্য প্রত্যাহারের পাশাপাশি এই বাজেটে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সব রকম ঔষধপত্র, শল্য চিকিৎসার সামগ্রী এবং দামি চিকিৎসার সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহের উপর। ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের ২৫৮৮.৯০ কোটি টাকার অনুপাতে এই বাজেটে ২০১৬-১৭ সালের জন্য ২৯৯৯.২২ কোটি টাকার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

শিক্ষা

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, মিড ডে মিল কর্মসূচির সফল রূপায়ণ, বিদ্যালয়গুলিতে শৌচাগার নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাদুকা প্রদান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নীতকরণ, ছাত্রাবাস নির্মাণ, বিদ্যালয়গুলিতে কম্পিউটার ও ব্রডব্যান্ড কানেকশান, ল্যাবরেটরি ও গ্রন্থাগার উন্নয়ন, প্রিপ্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এবং নবম ও দশম শ্রেণির তিনটি বিষয়ে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের উপর। বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ সালের ৮০৫৫ কোটি টাকার তুলনায় ২০১৬-১৭ সালে

৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যে যে সব অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার সুবিধা নেই সেই সমস্ত অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ শ্রেণি, তপশিলি জাতি ও উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা না কমিয়েও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য অতিরিক্ত আসন সংরক্ষণ গুরুত্ব পেয়েছে।

২০১৫-১৬ সালের ৩৯১ কোটি টাকার তুলনায় উচ্চ শিক্ষার এই বাজেটে ৪৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে।

কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিকাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট গঠন করা হয়েছে। পলিটেকনিক, আই.টি.আই এবং ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহারের নীতি নেওয়া হয়েছে। 'উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্প'-এর অধীনে বিদ্যালয় ছুট ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি প্রশিক্ষণে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২০১৫-১৬ সালের ৬৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বাজেটে ৭২৯.১৩ কোটি টাকা প্রস্তাবিত হয়েছে।

নারী বিকাশ, সমাজ কল্যাণ ও শিশু উন্নয়ন

বিদ্যালয়ছুট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমাতে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে রাজ্য সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প। এছাড়া 'মুক্তির আলো' প্রকল্পের মাধ্যমে যৌনকর্মীদের পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে 'শিশু আলয়' নামে 'আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন' পরিকাঠামো তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারী ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের জন্য এই বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে ১০০০ কোটি টাকা এবং শিশু বিকাশ বিভাগের জন্য ৩১৪৭.৫৪ কোটি টাকা। বিগত আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ৮৬৩.৯৮ এবং ২৮০৯.৮৩ কোটি টাকা।

সারণি-২
বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭

বিভাগ	২০১৫-১৬ সালের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
(১) তথ্য-প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিকস	১৬৪.৫০	১৮১.০০
(২) পর্যটন	২৫৭.০০	২৯৫.০০
(৩) বাণিজ্য ও শিল্প	৬৫৩.০০	৭৪৫.০০
(৪) অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র	৬১৮.০০	৭১৬.২৭
(৫) পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন	৩১৮.০০	৩৬০.৩৮
(৬) সুন্দরবন উন্নয়ন	৩৭০.০০	৪১৫.৭৫
(৭) উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন	৪৫০.০০	৫১৭.৪৭
(৮) স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি	৪০০.০০	৪৯৮.০০
(৯) অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন	৫০০.০০	৬৫০.০০
(১০) সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা	২০৩৩.০০	২৫০০.০০
(১১) আবাসন	৭৮৮.০০	৮৭০.০০
(১২) বিদ্যুৎ ও এনইএস	১২৯৫.০০	১৪৯৮.০০
(১৩) ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ	৩৪০.৮০	৪১৭.৮৫
(১৪) তথ্য ও সংস্কৃতি	২০০.০০	৩০০.০০
(১৫) স্বরাষ্ট্র	৫৯৩.১৮	৬৮১.২০
(১৬) বিপর্যয় মোকাবিলা	১১০.০০	১২১.১২
(১৭) অগ্নিসুরক্ষা ও জরুরি পরিষেবা	৯২.১০	১০৩.৮৫
(১৮) জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি	১৪৭০.০০	১৬৩০.৩৮
(১৯) পরিবহণ	৪৫০.০০	৫০১.৭৫
(২০) পূর্ত	২১৯৯.০০	২৬১৮.১১

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ বাজেট : ২০১৬-১৭

পৌর ও নগর উন্নয়ন

এই রাজ্যে দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে নতুন পৌরসভা গঠনের পাশাপাশি কয়েকটি পৌরসভাকে একত্রিত করে কর্পোরেশন গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূমিসংস্কার, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে শহরগুলির অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য টাউনশিপ পলিসির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল কলকাতা-সহ যানজট যুক্ত এলাকার উড়ালপুল নির্মাণ এবং সার্বিকভাবে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন। ২০১৫-১৬ সালের ১৮৯৫ কোটি টাকার তুলনায় এই বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২২০৭.৫৪ কোটি টাকা।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলির তুলনামূলক বাজেট বরাদ্দের একটা ধারণা পাওয়া যাবে সারণি-২ থেকে।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তব্যে জানিয়েছেন যে এই রাজ্যে তীব্র আর্থিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজস্ব ঘাটতি বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা কমানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও ২০১২ সাল থেকে এই রাজ্যে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সারণি-৩ থেকে ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক আর্থিক বিবরণ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিকাঠামোয় বেশকিছু প্রতিকূলতা এবং প্রত্যাশিতভাবে

সারণি-৩
পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৬-২০১৭

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত ২০১৪-২০১৫	বাজেট ২০১৫-২০১৬	সংশোধিত ২০১৫-২০১৬	বাজেট ২০১৬-২০১৭
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(–) ২২.৭৫	(–) ৩.০০	(–) ৩২৬.৪৩	(–) ৫.০০
২।	রাজস্ব আদায়	৮৬৫১৪.২১	১১৩১০০.২২	১১৫৪৩৫.৪৬	১২৮৯৪৪.৯১
৩।	মূলধনখাতে আদায়	০.০০	০.০০	৬৫৩.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৫১৯০০.৬৯	৫৯৮২৫.৯৮	৬৫৪৭৫.০০	৬৮৫৫২.০০
	(২) ঋণ	১৭৫.৪৯	৩৯৭.৪৯	৪৬৪.১৭	৪৮৬.৫৩
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৩৫৫৯২৯.৭৩	৩০৬৭৪০.৩২	৩৬০৭৬১.০৯	৩৬৭৭৩৩.৬২
	মোট	**৪৯৪৪৯৭.৩৭**	**৪৮০০৬১.০১**	**৫৪২৪৬২.২৯**	**৫৬৫৭১২.০৬**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১০৩৬৫১. ৬১	১১৩১০০.২২	১১৯৩০৪.৩০	১২৮৯৪৪.৯১
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	৯৮৭৮.৬১	১৫৬২৭.৬১	১৫৯৪৬.৯০	১৯১৯৬.৩১
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	২৮৩৮৮.২৯	৩৮৮৯৪.২১	৩৯২৫০.৬৩	৪০৬৭২.৪০
	(২) ঋণ	৫০৪.৭৭	৭৫১.৯৭	৬৭৮.১৯	৭৬০.০৬
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৩৫২৪০০.৫২	৩১১৬৯৪.০০	৩৬৭২৮৭.২৭	৩৭৬১৪৬.৩৮
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(–) ৩২৬.৪৩	(–) ৭.০০	(–) ৫.০০	(–) ৮.০০
	মোট	**৪৯৪৪৯৭.৩৭**	**৪৮০০৬১.০১**	**৫৪২৪৬২.২৯**	**৫৬৫৭১২.০৬**
	নিট ফল উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (–)				
	(ক) রাজস্বখাতে	(–) ১৭১৩৭.৪০	০.০০	(–) ৩৮৬৮.৮৪	০.০০
	(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১৬৮৩৩.৭২	(–) ৪.০০	৩৫৩৭.২৭	(–) ৩.০০
	(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নিট	(–) ৩০৩.৬৮	(–) ৪.০০	৩২১.৪৩	(–) ৩.০০
	(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নিট	(–) ৩২৬.৪৩	(–) ৭.০০	(–) ৫.০০	(–) ৮.০০
	(ঙ) নতুন প্রকল্পবাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
	(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	...
	(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
	(চ) নতুন প্রকল্পবাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ				
	(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	...
	(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
	(ছ) রাজস্ব করখাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	...	...	...	...
	(জ) রাজস্বখাতে নিট ঘাটতি	(–) ১৭১৩৭.৪০	০.০০	(–) ৩৮৬৮.৮৪	০.০০
	(ঝ) নিট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(–) ৩২৬.৪৩	(–) ৭.০০	(–) ৫.০০	(–) ৮.০০

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ বাজেট বক্তৃতা, ২০১৬-১৭

সেই সঙ্গে ঋণের বোঝা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন প্রত্যয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন চলার পথে তুফান আসতে পারে কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটির পথে পা রাখলে বা ভয় পেলে তা রাজ্যের পক্ষে যথার্থ হবে না।❑

[লেখক প্রাক্তন অনুষদ সদস্য, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।]

সাধারণ বাজেট ২০১৬-১৭

কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ক্ষেত্রে রেকর্ড বরাদ্দ এই বাজেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে বিপুল বরাদ্দ, নতুন সেচ ও শস্য বিমার ঘোষণা, সুদ মকুব করে কৃষকদের সুরাহা দিতে নতুন তহবিল—সব মিলে এ বাজেট নিঃসন্দেহে গ্রাম ও কৃষিকেন্দ্রিক। কিন্তু বাজেটে ঘোষিত পদক্ষেপগুলির মসৃণ রূপায়ণ কি সম্ভব? আলোচনা করেছেন **সিএসসি শেখর।**

২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের সাধারণ বাজেটে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের ওপর। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের যে প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে সে দিকে লক্ষ রেখে সেচ-সহ একগুচ্ছ নতুন উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পর পর দু বছর খরার কারণে ওই বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশও ঘটেছে অত্যন্ত মন্থরগতিতে। এমন এক প্রেক্ষাপটে এই বাজেট ঘোষণা।

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রের ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হলেও পরবর্তীকালে কৃষিক্ষেত্রের এই বিকাশ-হার থমকে পড়ে। ২০১২-১৩ সালে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশহার যেখানে ছিল ১.৫ শতাংশ সেখানে পরের দু বছরে এই বিকাশ-হার গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪.২ শতাংশ ও –০.২ শতাংশে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার (CSO) সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালে ১.১ শতাংশের পূর্বাভাসের তুলনায় সামান্য বেশি হবে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ। শুধু খরা নয়, সেচের সমস্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপকরণের অভাব তথা বিপর্যয়ের অব্যবস্থাও কৃষিক্ষেত্রের এই দৈন্য দশার জন্য সমানভাবে দায়ী। কৃষিক্ষেত্রের এই দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির কিছু কিছু সমাধানের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। বাজেটে মূলত সেচ, গ্রামীণ পরিকাঠামো ও বিপণন ব্যবস্থা সংক্রান্ত উদ্যোগের কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ, খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট বরাদ্দের ইতিবাচক তাৎপর্য আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ থমকে যাওয়ায় এবং খাদ্য উৎপাদন কমতে থাকায় দেশ এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে ২০০৪-০৫ সালের মধ্যে বছরে মাত্র ২.২ শতাংশ হারে কৃষিক্ষেত্রের জিডিপি-র বিকাশ ঘটেছে।

সবুজ বিপ্লবের আগেকার ছবিটাও ছিল ঠিক এইরকম। খাদ্য উৎপাদনের হারও কমেছে দ্রুতগতিতে। কৃষিক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পুঁজি কমতে থাকার ফলেই মূলত এই পরিস্থিতির উদ্ভব। তার ওপর কৃষিকাজ লাভজনক না হওয়ার দরুন বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার হ্রাস পায়। এর ফলে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির প্রথম ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ২০০৫-০৬ সালে। সরকারের তরফে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ তথা নানান কৃষি উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে ২০০৭-০৮ সালে চালু হওয়া বেশকিছু কর্মসূচি কৃষিক্ষেত্রের এই বিকাশের ধারাকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। রাজ্যগুলির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানোর কর্মসূচি (RVY)[১] এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি (NFSM) এই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই সমস্ত কর্মসূচির হাত ধরে গত কয়েক বছরে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের হার নির্দিষ্ট মাত্রা ছুঁতে পেরেছে। কিন্তু ফলনের অনিশ্চয়তা এবং বিপণন সংক্রান্ত নানা প্রতিবন্ধকতা এখনও এই ক্ষেত্রের কাছে একটা বড় সমস্যার কারণ হয়ে রয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির কিছু কিছু সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবারের বাজেটে।

সেচ

বৃষ্টির জলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান সমস্যা। দেশের যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয় তার মাত্র প্রায় ৪৫ শতাংশ জমি রয়েছে সেচের আওতায়। যার ফল ফসল উৎপাদনের ব্যাপক অনিশ্চয়তা। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার (PMKSY) মাধ্যমে এই সমস্যাটিকে বহুলাংশে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে এই বাজেটে। সেচের এই বৃহৎ উদ্যোগে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৭ হাজার কোটি টাকা। নতুন প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য। ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচির (AIBP) আওতায় অচল হয়ে পড়া ৮৯টি সেচ প্রকল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৮১ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের সুবিধা পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভূগর্ভস্থ জলসম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী জাতীয়

গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের (MGNREGS) আওতায় চাষের পুষ্করিণীর সংস্কার, কূপখনন ও কূপগুলিকে পলিমুক্ত করার জন্য পরিপূরক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২৫ হাজার কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি সেচ তহবিলের সঙ্গে এই সমস্ত উদ্যোগ যুক্ত হলে তা নিঃসন্দেহে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত করবে।

ঋণ ও বিমা

ঋণ পাওয়ার সমস্যা কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। কৃষিঋণ ও কৃষিক্ষেত্রের জিডিপি-র অনুপাত ১৯৯৯-২০০০ সালের ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১২-১৩ সালে ৩৮ শতাংশে পৌঁছলেও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের পরিমাণ চোখে পড়ার মতো কমেছে। ২০০৬-০৭ সালে এই ঋণের পরিমাণ যেখানে ছিল ৫৫ শতাংশ ২০১১-১২ সালে লক্ষণীয়ভাবে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। কৃষিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে এই ছবিটাকে বদলাতে হবে। এই কথা মাথায় রেখেই চলতি বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে ৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ জোগানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার। এর পাশাপাশি সুদ মকুবের মাধ্যমে কৃষকদের সুরাহা দিতে ১৫ হাজার কোটি টাকার সংস্থানও রাখা হয়েছে বাজেটে। তবে প্রকৃত পক্ষেই চাষবাস করে যাঁরা দিন গুজরান করেন তাঁরা ঋণের সুযোগ পাচ্ছেন কি না তা ওপর কিন্তু অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আর জমি বা বর্গার ওপর আইনি অধিকার ছাড়া তাদের পক্ষে ঋণ পাওয়া সম্ভব নয়। জলবায়ুর খামখেয়ালি আচরণের দরুন ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হলে কৃষকদেরও দুর্গতির অন্ত থাকে না। ফসল উৎপাদনের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য সম্প্রতি নতুন করে ঢেলে সাজানো একটি বিমা প্রকল্পের কথা (PMFBY বা প্রধানমন্ত্রীর ফসল বিমা যোজনা) ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই শস্য বিমা প্রকল্পখাতে ৫,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ফসলের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে এই বিমা প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। খাদ্যশস্য এবং তৈলবীজের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার মাত্র ২ শতাংশের মতো এবং উদ্যানজাত ফসল ও কার্পাসের ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার ধার্য করা হয়েছে ৫ শতাংশ। এই বিমা প্রকল্পের সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক হল এই যে এখানে প্রিমিয়ামের কোনও সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি ফলে 'সাম অ্যাশিওর্ড' বা প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সারের ভরতুকির সুবিধা সরাসরি হস্তান্তরের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারের ভরতুকির অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এগুলি সবই অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ, কোনও সন্দেহ নেই। তবে জমি বা বর্গার ওপর আইনি অধিকারের নথিপত্র না থাকলে চাষিদের পক্ষে এই সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া সম্ভব নয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

সংগ্রহ, বিতরণ ও বিপণন

অনলাইন প্রযুক্তি ও একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগ্রহের একটি বিকেন্দ্রীভূত উদ্যোগে আরও বেশি রাজ্যকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সংগ্রহের মাধ্যমে ডালের একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলারও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৫.৩৫ লক্ষ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মধ্যে ৩ লক্ষ দোকানে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা চালু করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি-প্রযুক্তি পরিকাঠামো তহবিলের (AITF) মাধ্যমে একটি জাতীয় কৃষি বাজার স্থাপনের প্রকল্পের বিষয়টি গত ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় ৫৮৫টি নিয়ন্ত্রিত বাজারকে যুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে চলতি বাজেটে। তবে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের পথেও কিছু বাধা রয়েছে, এই পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণের জন্য রাজ্যগুলিকে উদ্যোগী হতে হবে। এর জন্য প্রতিটি রাজ্যকে তাদের নিজ নিজ কৃষি পণ্য বিপণন কমিটি আইনে (APMC) সংশোধন আনতে হবে। এজন্য রাজ্যজুড়ে একক লাইসেন্স ব্যবস্থা, বাজারে মূল্য আদায়ের অভিন্ন ব্যবস্থা, তথা মূল্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খুঁজে পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিন নিলাম-সহ পুরো ব্যবস্থাপনার খোলনলচে বদলাতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে। এ পর্যন্ত মাত্র ১২টি রাজ্য তাদের APMC আইন সংশোধন করেছে এবং উপরোক্ত প্রকল্পটিকে পুরোপুরিভাবে চালু করতে গেলে অন্য রাজ্যগুলির তরফেও দ্রুত পদক্ষেপ চাই।

ফসল সংগ্রহের পরবর্তী সময়ে অপচয় ভারতের উদ্যানপালন ক্ষেত্রের কাছে একটা বিরাট সমস্যা। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এ দেশে যে পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয় তার ২০ শতাংশই ফসল সংগ্রহপরবর্তী বিভিন্ন স্তরে নষ্ট হয়ে যায় (APEDA, ২০০৭)। এমনকী সর্বশেষ খতিয়ান থেকেও দেখা গেছে যে দেশে ফলমূল ও শাকসবজির প্রায় ১৫ শতাংশ নষ্ট হয় (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-১৬, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১৫)। মূল্যবান ফলমূল ও শাকসবজির এই বিপুল অপচয় যথেষ্ট চিন্তার কারণ এবং এ নিয়ে অবিলম্বে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। ভারতে চাষ হওয়া ও উৎপাদিত (ম্যানুফ্যাকচার্ড) খাদ্যপণ্যের বিপণনে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নিতে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলবে। এর ফলে ফসল সংগ্রহপরবর্তী অপচয় অনেকাংশে কমবে বলে আশা করা যায়।

গ্রামোন্নয়ন

গ্রামোন্নয়নখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৮৭,৭৬৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পের (MGNREGS) জন্যই বরাদ্দ রয়েছে প্রায় ৩৮,৫০০ কোটি টাকা। গ্রামীণ ক্ষেত্রের জন্য এত বেশি বাজেট বরাদ্দ এর আগে কখনও হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে বর্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দেওয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে প্রায় ২.৮৭ লক্ষ কোটি টাকা। হিসাব অনুযায়ী, অনুদান বাবদ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত

পাবে ৮০ লক্ষ টাকা, যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY) খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি গ্রামোন্নয়নের পথে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। সামগ্রিকভাবে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য গ্রামীণ ক্ষেত্র, আলাদাভাবে বলতে গেলে গ্রামীণ নির্মাণ, পরিবহণ ও পরিষেবা ক্ষেত্রই সাম্প্রতিক অতীতে কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যে কর্মসংস্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।

বাজেটের সীমাবদ্ধতা

অনেক ক্ষেত্রেই এই বাজেট আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

প্রথমেই আসি কৃষিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দানের প্রসঙ্গে। কৃষি আদতে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় এবং এই ক্ষেত্রের বিকাশের স্বার্থের রাজ্যগুলিকে বিনিয়োগ বাড়াতেই হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। কৃষিক্ষেত্রে মোট মূলধন সৃষ্টির পরিমাণ (কৃষিক্ষেত্রে মোট মূল্য সংযুক্তির শতাংশের বিচারে) ২০১১-১২ সালে যেখানে ছিল ১৮.৩ শতাংশ, ২০১৪-১৫ সালে সেখানে তা নেমে এসেছে ১৫.৮ শতাংশে। ২০০৪-০৫ সাল থেকে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ যেভাবে দ্রুত বেড়েছিল সেইরকম দ্রুততার সঙ্গেই সাম্প্রতিক কয়েক বছরে এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমেছে। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের এই শ্লথগতির জন্য কিন্তু পুঁজির এই অভাবকেই কিছুটা দায়ী করা যায়। রাজ্যগুলি যাতে কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি করে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে সেজন্য কোনও কার্যকর প্রস্তাব বা উৎসাহ দান প্যাকেজের কথা বাজেটে নেই।

ওপরতলা থেকে নীচতলার জন্য গৃহীত কর্মসূচির ত্রুটিও এই বাজেটে স্পষ্ট। বৈচিত্রময় এই দেশ ভারতে কৃষি জলবায়ুগত অবস্থাতেও ব্যাপক বৈচিত্র রয়েছে। চলতি বাজেটে যে ব্যাপক সেচ প্রকল্প, শস্য বিমা প্রকল্প বা অন্যান্য যেসব কর্মসূচির কথা রয়েছে সেগুলিকে সফল করে তুলতে গেলে স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির উপযোগী করে গড়ে নিতে হবে। কিন্তু বাজেটে ঘোষিত বৃহৎ এই সমস্ত কর্মসূচিগুলির মধ্যে ওপরতলা থেকে সরাসরি নীচের তলার প্রয়োগের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার (RKVY) আওতায় বিভিন্ন রাজ্যের তরফে তৈরি জেলা কৃষি পরিকল্পনাগুলিতে (DAP) যে অঞ্চলভিত্তিক তথ্য থাকে সেই তথ্যকে এই লক্ষ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। (সেন, ২০১৬)

ঋণ, সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর ও বিমার মতো প্রস্তাবিত উদ্যোগের সাফল্য মূলত যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল সেটি হল প্রজাস্বত্বের সংস্কার তথা জমি সংক্রান্ত নথিপত্রের আধুনিকীকরণ। সুবিধাভোগীদের সঠিকভাবে শনাক্ত করা না গেলে প্রস্তাবিত এই উদ্যোগগুলির যথাযথ রূপায়ণ সম্ভব নয়। প্রস্তাবিত উদ্যোগগুলির অধিকাংশেরই সফল রূপায়ণের জন্য জমি সংক্রান্ত নথিপত্রের আধুনিকীকরণ, সম্পত্তির অধিকারে সুরক্ষা দান এবং প্রজাস্বত্ব সংস্কারের কাজ একান্ত আবশ্যক। ভাগচাষ সংক্রান্ত চুক্তিকে একটা আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রজাস্বত্ব আইনে দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন। তাতে প্রকৃত চাষিদের ঋণ পেতে সুবিধা হবে। শস্য বিমা বা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির ইচ্ছুক সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার একটা সহজ উপায় রয়েছে। প্রজাস্বত্ব সংস্কারের অন্যান্য সুবিধা যাদের কাছে পৌঁছবে তাদেরই এই ধরনের বিমা বা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বর্তমানে প্রকৃত চাষিদের কাছে এই সমস্ত সুবিধা এসে পৌঁছয় না। এই সুবিধা তারাই পায় যারা খাতায়-কলমে জমির মালিক। অথচ চাষবাসের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্কই নেই। সেই সঙ্গে জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জমি সংক্রান্ত নথিপত্রের আধুনিকীকরণেরও একান্ত প্রয়োজন। রাজ্যগুলির তরফে ভূমি রাজস্ব, জমির নথিভুক্তি ও জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার নথির ডিজিটালাইজেশন ও এগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন অবিলম্বে প্রয়োজন (নীতি আয়োগ, ২০১৫)। সম্প্রসারণ পরিষেবার ওপরও আলোকপাত করা প্রয়োজন। চলতি বাজেট-সহ সাম্প্রতিক কয়েক বছরের বাজেটেই কৃষির এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিতে তেমন কোনও নজর দেওয়া হয়নি। সম্প্রসারণমূলক পরিষেবার অভাবের ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তি বা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে কৃষকদের মধ্যে তেমন করে কোনও সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশের স্বার্থেই সম্প্রসারণ বা এক্সটেনশন পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে হবে।❑

[লেখক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর।
email : esekhar@iegindia.org]

---

(১) রাজ্যগুলির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় (RKVY)। কারণ কৃষি আদতে 'রাজ্য' তালিকাভুক্ত বিষয়। পাঁচ বছরের সীমিত সময়ে খাদ্য উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশনে (NFSM)।

উল্লেখপঞ্জি :

APEDA (2007), *Taking Indian Frozen Products Across the Globe,* Frozen Fruits and Vegetables Report, Technopak Advisors Pvt. Ltd., Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority, Jan. 2007

Niti Aaaayog (2015), "Raising Agricultural Productivity and Making Farming Remunerative for Farmers", *Occassional Paper,* Niti Aaayog, 16 December 2015

Sen, Abhijit (2016), "Some Reflections on Agrarian Prospects", *Economic & Political Weekly,* February 20, vol LI no 8

জানেন কি?

মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল

ভাটিকা চন্দ্রা

একটা নির্দিষ্ট স্তরের নীচে কোনও কৃষিপণ্যের দাম নেমে গেলে সেই সব কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ কমাতে ও আর্থিক সাহায্য দিতে 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল' (প্রাইস স্টেবিলাইজেশন ফান্ড বা সংক্ষেপে পিএসএফ) গড়ে তোলা হয়। এর আরেকটা লক্ষ্য হল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এককালীন সহায়তা দেওয়ার বদলে কৃষি-উৎপাদনকারীদের দীর্ঘমেয়াদে সাহায্য দেওয়া বজায় রাখা—কারণ, নিত্যপণ্যের (এসেনশিয়াল কমোডিটিস) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সুপ্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গত কয়েক বছরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চা, কফি, রাবার ও তামাকের দাম কমে যাওয়ার ফলে প্রাথমিক উৎপাদকেরা সংকটে পড়েন। সেই জন্যই বাণিজ্য বিভাগ একটা 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল' গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর্থিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি (সিসিইএ) ২০০২ সালের জুন মাসেই এই তহবিলকে নৈতিক-অনুমোদন (ইন-প্রিন্সিপাল অ্যাপ্রুভাল) দেয়। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের পর, সে বছরই এপ্রিল মাসে 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল' প্রকল্পের সূচনা হয়।

এই প্রকল্প মূলত অংশগ্রহণমূলক। যে কোনও বছরে ফসলের উৎপাদন স্বাভাবিক (নর্মাল ইয়ার), অতিরিক্ত (বুম ইয়ার) না খারাপ (ডিস্ট্রেস ইয়ার) হয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করে সরকার ও উৎপাদনকারীরা এই তহবিলে অর্থ জমা করে। যে বছর ফলন স্বাভাবিক মাত্রায় হয়, সে বছর সরকার প্রত্যেক উৎপাদনকারীর মাথাপিছু ৫০০ টাকা জমা করে এবং প্রত্যেক উৎপাদনকারীরও ব্যক্তিগতভাবে ৫০০ টাকা জমা দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে টাকা তুলে নেওয়ার কোনও সুযোগ থাকে না।

অতি ফলন হলে শুধুমাত্র উৎপাদনকারীরা নিজেই ১০০০ টাকা জমা করে এবং এ ক্ষেত্রেও টাকা তুলে নেওয়ার কোনও সুযোগ থাকে না। তবে সংকটজনক পরিস্থিতিতে সরকার একাই প্রত্যেক উৎপাদনকারীর মাথাপিছু ১০০০ টাকা জমা করে এবং এ ক্ষেত্রে যে কোনও উৎপাদনকারী ১০০০ টাকা পর্যন্ত তুলে নিতে পারে। এর জন্য প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে নির্দিষ্ট ব্যাংকগুলোর যে কোনও একটায় পিএসএফ সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। যে কোনও ক্ষুদ্র চাষিও ৫০০ টাকা জমা দিয়ে এই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারে।

প্রথম পর্যায় এই প্রকল্প ১০ বছর, অর্থাৎ ২০০৩ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ চালু ছিল। প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর এই প্রকল্প নিয়ে পুনরালোচনা করে এর সংশোধন করার কথা। গোড়ার দিকে মোট ১২ লাখ ৭৭ হাজার কৃষি-উৎপাদকদের মধ্যে ৩ লাখ ৪২ হাজার ক্ষুদ্র চাষি, বিশেষত যাদের জমির আয়তন ৪ হেক্টর বা তার কম, তাদের এই প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়। এই তহবিলের পুঁজি ভারত সরকারের সরকারি অ্যাকাউন্টে সঞ্চিত হয়। তবে এই পুঁজি ব্যয় করা হয় না। 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল' প্রকল্পের খরচ শুধুমাত্র এই সঞ্চিত পুঁজির ওপর অর্জিত সুদ থেকেই চালানো হয়।

২০১৬-১৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল'-এর জন্য পুঁজি হিসেবে ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 'মূল্য স্থিরিকরণ তহবিল'-এর মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়তা মূল্যে ও বাজার মূল্যে ডাল শস্য কিনে 'বাফার স্টক' (মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য মজুত করা দ্রব্য) গড়ে তোলা হবে।❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(জানুয়ারি ২০১৬)

বহির্বিশ্ব

- **জিকার প্রকোপ :**

মশার হুল বেয়ে এবার হানা দিচ্ছে নতুন বিপদ, একেবারেই অচেনা রোগ—জিকা। জিকা ভাইরাসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছে ভেনেজুয়েলা ব্রাজিল, কলম্বিয়া, এল সালভাদোর, হন্ডুরাস, জামাইকায়। ব্রাজিলে গত কয়েক মাসে ৪০০০ শিশু জন্ম নিয়েছে মাইক্রোসেফ্যালি আক্রান্ত হয়ে। অর্থাৎ তাদের মাথা শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের ছোট হচ্ছে। মস্তিষ্কের গঠন অসম্পূর্ণ থাকায় এমন শারীরিক বিকৃতি। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন, গর্ভবতী মহিলারা জিকায় আক্রান্ত হলে তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের উপর এর প্রভাব পড়ছে। জিকা গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিচ্ছে। তার ফলই হল মাইক্রোসেফ্যালি আক্রান্ত হয়ে নবজাতকের জন্ম। জিকার প্রকোপ ক্রমশ বাড়তে থাকায়, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সরকার মহিলাদের আপাতত সন্তান ধারণ না করার আর্জি জানাতে শুরু করেছে।

- **ভিয়েতনামে ভারতীয় উপগ্রহ কেন্দ্র :**

দক্ষিণ ভিয়েতনামে উপগ্রহ নজরদারি কেন্দ্র গড়তে চলেছে ভারত। যাতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করবে। এই কেন্দ্র থেকে অসামরিক উপগ্রহের উপরে নজর রাখা হবে। হো চি মিন সিটিতে ভারতের উপগ্রহ নজরদারি কেন্দ্রে তথ্য সরাসরি ব্যবহার করবে ভিয়েতনামও। ভারতের উপগ্রহ থেকে আসা চিত্র একসঙ্গে বিশ্লেষণ করবেন দু-দেশের বিশেষজ্ঞেরা। তাতে কৃষি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগোনো সহজ হবে।

- **ভারতের পাশে ওবামা-ওলাদঁ :**

গত বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের অতিথি হিসেবে দিল্লিতে ছিলেন বারাক ওবামা। এবারের অতিথি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাদঁ ২৫ জানুয়ারি ভারতে আসেন। পাঠানকোট হামলা নিয়ে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাস প্রতিরোধে পাকিস্তানের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন ওবামা ও ওলাদঁ দুজনেই। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একই সঙ্গে বিশ্বের প্রধান শক্তিধর দুই দেশকে পাশে পেল ভারত।

পুরনো বন্ধু পাকিস্তানকে রেয়াত করে আসার যে নীতি মার্কিন প্রশাসন বরাবর নিয়ে এসেছে, ওবামার আমলে তার কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে। ক্ষমতায় এসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানে লুকিয়ে রয়েছেন ওসামা বিন লাদেন। তার পরে পাকিস্তানের মাটিতে অভিযান চালিয়ে আল কায়দার এই নেতাকে নিকেশ করে মার্কিন কম্যান্ডোরা।

পাঠানকোটের আগেই প্যারিস। কিছু দিন আগেই সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গিদের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছে ফ্রান্সের রাজধানী শহর। স্বাভাবিকভাবেই পাঠানকোট সন্ত্রাস নিয়ে তাঁর গলায় সমব্যথীর সুর।

- **শ্রীলঙ্কায় নোঙর করল দুই ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ :**

ভারতীয় নৌসেনার সবচেয়ে বড় এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রমাদিত্য নোঙর করল কলম্বোতে। ২১ জানুয়ারি কলম্বোয় নোঙর করেছে আইএনএস বিক্রমাদিত্য এবং আইএনএস মাইসোর। ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত দুই ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সেখানে থাকবে। ভারতীয় নৌসেনার যুদ্ধজাহাজ দুটি ঘিরে শ্রীলঙ্কায় প্রবল উৎসাহও দেখা দিয়েছে। সে দেশের নৌসেনার আধিকারিকরা ভারতীয় নৌসেনার যুদ্ধজাহাজগুলি ঘুরে দেখেন ২১ জানুয়ারি। স্কুল পড়ুয়াদেরও সুযোগ করে দেওয়া হয় আইএনএস বিক্রমাদিত্য দেখার। ভারতের তরফে জানানো হয়েছে, নৌসেনার দুই যুদ্ধজাহাজ 'গুডউইল ভিজিট' অর্থাৎ 'সম্ভাবনা সফর'-এ কলম্বো গিয়েছে।

- **প্রায় দেড় শতক পুরনো খ্রিস্টান মঠ ইরাকে গুঁড়িয়ে দিল আইএস :**

ইরাকে ১৪০০ বছরের পুরনো খ্রিস্টান মঠ ধ্বংস করে দিল আইএস। তবে খুব সম্প্রতি ওই খ্রিস্টান মঠ ধ্বংস হয়নি। ২০১৪ সালের শেষ দিকে আইএস ওই মঠটি ধ্বংস করে বলে জানা গিয়েছে। ধ্বংসের ছবি সামনে আসার পর গোটা বিশ্ব এই বর্বরতার নিন্দায় মুখর। উপগ্রহ চিত্রে এই ধ্বংসলীলা ধরা পড়ার পর ইরাকের সরকারও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। আফগানিস্তানে তালিবান শাসন চলাকালীন বামিয়ানে ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ইরাকে আইএস সেই পথেই হাঁটছে।

মসুল শহর থেকে একটু দূরে যে এলাকায় খ্রিস্টান মঠটি ধ্বংস করা হয়েছে, সেটি এখন আইএস-এর মুক্তাঞ্চল। ইরাকের সরকারের নিয়ন্ত্রণ সেখানে নেই। ইরাকি সেনা সেখানে ঢুকতেও পারে না। ফলে প্রায় দেড় শতক পুরনো ঐতিহাসিক নিদর্শন যে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সে খবর বাগদাদে পৌঁছয়নি এত দিন।

ইরাকের খ্রিস্টান অতীতকে শেষ করে দিতে আইএস ইরাক এবং সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ঐতিহাসিক ইমারত গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করেছে অনেক দিন ধরেই। মসুল শহরের কাছে এই খ্রিস্টান মঠ ধ্বংস করা আইএস-এর সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ।

- **পাক বিশ্ববিদ্যালয় হামলায় ৪ জঙ্গি-সহ নিহত ২৪ :**

পাকিস্তানের পেশোয়ারে চারসাদ্দা-র বাচা খান ইউনিভার্সিটি। যাঁর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বাচা খান বা খান আবদুল গফফর খানের মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ২১ জানুয়ারি। খান আবদুল গফফর খান

পরিচিত ছিলেন 'সীমান্ত গান্ধী' নামেও। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও তাঁর অহিংস পথের অনুরাগী। তিনি আজীবন ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান গঠনের বিরোধী, এই শান্তির দূতকে কোনও দিনই পছন্দ করে না কট্টরপন্থীরা। তাঁরই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁরই মৃত্যুবার্ষিকীতে আঘাত করল জঙ্গিরা।

সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তখন হাজার তিনেক পড়ুয়া। বিশেষ দিন বলে এসেছেন আরও প্রায় ৬০০ অতিথি। ঢুকেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে জঙ্গিরা। সরকারি হিসেবে নিহত ৪ জঙ্গি-সহ ২৪। এদের মধ্যে ১৮ জন ছাত্র, একজন শিক্ষক ও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। আহতের সংখ্যা ১১।

ঠিক ১৩ মাস ৪ দিন। ২০১৪-র ১৬ ডিসেম্বর এই পেশোয়ারেরই সেনা-স্কুলে ১৩৩টি শিশুর শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছিল জঙ্গিরা।

● **নিষেধের বেড়া-মুক্ত ইরান :**

দীর্ঘ এক দশক পরে ইরানের উপর থেকে যাবতীয় অর্থনৈতিক অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের অপেক্ষায় এখন গোটা বিশ্ব। রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা কেটে যেতেই তেহরান জানিয়ে দিয়েছে, এখন থেকে রোজ ৫ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল গোটা বিশ্বে পাঠাতে চলেছে তারা।

তেহরান সরকার গোপনে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছে, এই সন্দেহ থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি তাদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল। পরমাণু কর্মসূচির উপর নজরদারি করে থাকে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা, সেই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি তেহরানকে যাবতীয় পরমাণু কর্মসূচি থেকে সরে আসার জন্য বললেও এক দশক আগে এতে সহযোগিতার মনোভাব দেখায়নি ইরান। ফলে বাণিজ্য ও তেল রপ্তানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ইরানকে এক ঘরে করে দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিশ্বের প্রধান শক্তিশালী দেশগুলি।

● **বুরকিনা ফাসোর হোটেলে জঙ্গি হামলায় নিহত ২৯ :**

১৫ জানুয়ারির রাতে বুরকিনা ফাসোর রাজধানী শহর আউয়াগাদৌগৌয়ের একটি বিলাসবহুল হোটেল ও সংলগ্ন একটি কাফেতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। নিহত ২৯। নিহতদের বেশিরভাগই বিদেশি পর্যটক। আহত অন্তত ৩০। পুলিশি তৎপরতায় ১২৬ জন পণবন্দিকেই উদ্ধার করা হয়েছে।

ফের জঙ্গি-নিশানায় রেস্তোরাঁ। জাকার্তার মার্কিন কফি শপ স্টারবাক্সের পর এবার বুরকিনা ফাসোর বিলাসবহুল হোটেল এবং সংলগ্ন কফি শপ রক্তাক্ত হল জঙ্গিগোষ্ঠী আল কায়দা আক্রমণে। চার তারা ওই হোটেলটিতে বিদেশি কূটনীতিক এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদেরই যাতায়াত বেশি। পর্যটক ও কর্মীদের পণবন্দি করে সেখানে কয়েক ঘণ্টা তাণ্ডব চালায় আল কায়দার শাখা সংগঠন 'আকিম'-এর জঙ্গিরা। পণবন্দিদের মুক্ত করতে শুরু হয় পুলিশ-জঙ্গি গুলির লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১৬ জানুয়ারি সকালে হোটেল থেকে ১২৬ জন পণবন্দিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এই দেশ

● **পাঠানকোটে বিমানঘাঁটিতে জঙ্গি হানা, খতম ৬ জঙ্গি :**

গুরদাসপুরে জঙ্গি হামলার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ফের একবার রক্তাক্ত হল পাঞ্জাব। ২ জানুয়ারি রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর পোশাকে ঢুকে পড়ে ছয় জঙ্গি। ঘাঁটির যে অংশে যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার রাখা থাকে সেদিক থেকে হামলা চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ডের জওয়ানরা। টানা অভিযান চালিয়ে খতম করা হয় ৬ জঙ্গিকে। শহিদ হয় ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর ৭ জন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৯ জানুয়ারি আক্রান্ত বায়ুসেনা ঘাঁটি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, সেনাপ্রধান দলবীর সিংহ সুহাগ ও বায়ুসেনা প্রধান অরূপ রাহা। জখম জওয়ানদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেন।

পাঠানকোটে গিয়ে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, হামলা প্রতিরোধের সময় যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং যেভাবে তার প্রয়োগ হয়েছে, তা সন্তোষজনক।

● **জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদের জীবনাবসান :**

মারা গেলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ সঈদ। ৭ জানুয়ারি সকালে দিল্লির এইমসে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

মুফতি মুহম্মদ সঈদ (জন্ম : ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৬) জম্মু ও কাশ্মীরের পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির স্থাপক ও বরিষ্ঠ নেতা ছিলেন। তিনি এর আগে ২০০২-২০০৫ এই সময়কালেও জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও ছিলেন।

গত ২৪ ডিসেম্বর জ্বর এবং ঘাড়ে যন্ত্রণা নিয়ে তিনি দিল্লির এইমস হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। দিন কয়েক তাঁর অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ভেন্টিলেটরে রাখা হয় সঈদকে। ৭ জানুয়ারি সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মাল্টি অর্গ্যান ফেলিওরেই মৃত্যু হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর।

● **আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে, ভারতে দুর্নীতি কমছে :**

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)-এর ২০১৫ সালের বার্ষিক রিপোর্ট ২৭ জানুয়ারি প্রকাশিত হল। বার্লিনভিত্তিক এই সংস্থাটি দুর্নীতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক ওয়াচডগ হিসেবে বিখ্যাত।

টিআই রিপোর্টে দেওয়া ১৬৮টি দেশের তালিকায়, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার নিরিখে ভারতের স্থান ২০১৫-তে ৭৬ নম্বরে। ২০১৪ সালে ৮৫ নম্বরে ছিল ভারত। ২০১৩ সালে ছিল ৯৪ নম্বরে। স্বচ্ছতার পরীক্ষায় ১০০-য় ভারতের স্কোর ৩৮। একই স্কোর নিয়ে ভারতের সঙ্গে একই স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিল অবশ্য এবার ৬৯ থেকে নেমে এল ৭৬ নম্বরে।

এবারও সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ডেনমার্ক। স্কোর ১০০-তে ৯১। ৮১ করে পেয়ে ১০ নম্বরে আছে তিন দেশ—ইংল্যান্ড, জার্মানি আর লাক্সেমবার্গ। ৭৬ স্কোর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া আছে তালিকার ১৬ নম্বরে। ১০০-তে মাত্র ৮ করে পেয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দুই দেশ হল উত্তর কোরিয়া এবং সোমালিয়া।

দুর্নীতিমুক্ত থাকার প্রশ্নে পৃথিবীর সেরা দেশগুলির ধারেকাছেও নেই আমরা। কিন্তু আশার কথা, গত কয়েক বছর ধরেই ক্রমশ উন্নতি করছে ভারত। অর্থাৎ কিছুটা হলেও দুর্নীতি কমছে।

- **একাত্তরে পাক যুদ্ধের নায়ক জ্যাকব প্রয়াত :**

দীর্ঘ রোগভোগের পরে ১৩ জানুয়ারি সকালে দিল্লির একটি হাসপাতালে মারা গিয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জ্যাকব। ৯২ বছর বয়সে স্মৃতিভ্রংশ-সহ নানা অসুখের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় ১ জানুয়ারি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনার আত্মসমর্পণে প্রধান ভূমিকা ছিল ইস্টার্ন কম্যান্ডের তৎকালীন চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জ্যাকবের। সেই আত্মসমর্পণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চূড়ান্ত জয় হয় ভারতের, জন্ম নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাঁর লেখা 'সারেন্ডার ইন ঢাকা, বার্থ অব এ নিউ নেশন' এবং 'অ্যান ওডেসি ইন ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এ সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে সেই সময়ের। বছর দুয়েক আগে মুক্তিযুদ্ধ সম্মান নিতে ঢাকায় গিয়েছিলেন তিনি।

বাগদাদ থেকে কলকাতায় আসা এক ইহুদি ব্যবসায়ী পরিবারে ১৯২৩-এ জন্ম জ্যাকবের। বাবার আপত্তি সত্ত্বেও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যান। প্রথম মোতায়েন হন ইরাকেরই কিরকুকে। পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার। গোয়া ও পাঞ্জাবে রাজ্যপালের দায়িত্বও পালন করেছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জ্যাকব।

এই রাজ্য

- **ফাটকা ঠেকাতে চটের বস্তা ও কাঁচা পাটের দাম বেঁধে দেবে কেন্দ্র :**

পাট শিল্পে ফাটকা ঠেকাতে এবং চটজাত পণ্য রপ্তানির বাজার ফিরে পেতে এবার কাঁচা পাটের দামও বেঁধে দিতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর আগে চটের বস্তার দাম সম্প্রতি বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক।

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী কাঁচা পাট মজুত করতে থাকায় বেশ কিছু দিন ধরে হু হু করে বাড়ছে কাঁচা পাটের দাম। বস্তা তৈরির কাঁচা মাল হল কাঁচা পাট। কাঁচামালের দাম বাড়তে থাকলে বস্তা তৈরির উৎপাদন খরচ দিন দিন বাড়বে। অথচ কেন্দ্র দাম বেঁধে দেওয়ার ফলে বস্তার দাম তাঁরা বাড়াতে পারবেন না। অবস্থা সামাল দিতে এই প্রথম চটের বস্তার দাম বেঁধে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার এবং কাঁচা পাটের ক্ষেত্রেও একই পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র। এবার কাঁচা পাটের দামও বেঁধে দেওয়া হলে চটকলগুলির সমস্যা কিছুটা কমবে বলে মনে করছে পাট শিল্পমহল।

- **স্টার্ট-আপে লগ্নির সংস্থাও বাড়ছে রাজ্যে :**

ধীরে হলেও রাজ্যে তৈরি হচ্ছে স্টার্ট-আপ বা সদ্যোজাত সংস্থা তৈরির পরিবেশ। শুধুই ওই ধরনের সংস্থা নয়, একই সঙ্গে বাড়ছে স্টার্ট-আপে লগ্নিকারীর সংখ্যাও। স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে বেঙ্গালুরুর তুলনায় এখনও বহু পিছিয়ে কলকাতা। তবে তারা এখন দৌড় ভালোই শুরু করেছে বলে সংশ্লিষ্টমহলের দাবি। নতুন ব্যবসার টানে লগ্নিকারীরাও আসতে শুরু করেছে।

স্টার্ট-আপ সংস্থার হাত ধরে নতুন বিনিয়োগ টানতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই দৌড়ে এগিয়ে থাকতে রাজস্থান, কর্ণাটক, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো কয়েকটি রাজ্য তৈরি করে ফেলেছে স্টার্ট-আপ নীতি। সদ্য সমাপ্ত বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে পশ্চিমবঙ্গও এই নীতি ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, ১৬ জানুয়ারি স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার মঞ্চে নতুন ব্যবসা শুরুর পথ মসৃণ করতে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তবে এখনও বেঙ্গালুরু বা দিল্লির তুলনায় কলকাতায় স্টার্ট-আপ সংস্থার সংখ্যা কম। দেশে যত প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্টার্ট-আপ তৈরি হয়, তার প্রায় ৪০ শতাংশের শিকড় বেঙ্গালুরুতে। দিল্লিতে ২০ শতাংশ, পুনে-মুম্বইয়ে ১৫ শতাংশ। কলকাতা-সহ পূর্বাঞ্চলে তা মাত্র ১০ শতাংশ। গত এক দশকে ৩০০ কোটি ডলার ৩,০০০ স্টার্ট-আপ সংস্থায় ঢালা হয়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ এসেছে বিদেশি উদ্যোগ পুঁজির তহবিল থেকে। যার ছিটেফোঁটা এ রাজ্যে এসেছে।

- **শক্তিগড়ে বেসরকারি লগ্নিতে রাজ্যের প্রথম জুট পার্ক :**

বেসরকারি উদ্যোগে রাজ্যে তৈরি হল জুট পার্ক। দক্ষিণ বর্ধমানের শক্তিগড়ে ১৯ জানুয়ারি রাজ্যের প্রথম জুট পার্কটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৫ একর জমির উপর এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ ১২৫ কোটি টাকা। লগ্নিকারীদের দাবি, এখানে ৩ হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান হবে, যার সিংহভাগই মহিলাকর্মী।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পাট কমিশনার সুব্রত গুপ্ত বলেন, কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক জুট টেকনোলজি মিশনের অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পার্ক গড়ার পরিকল্পনা করেছে। প্রতিটি পার্কে পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৭.৫০ কোটি টাকা করে কেন্দ্রীয় অনুদানের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চায়, শুধু বস্তা তৈরির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরিতে এই শিল্পকে উৎসাহ দিতে। পড়শি বাংলাদেশের পাট শিল্প এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। ভারতেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

● **রাজ্যে দু'দিনের শিল্প সম্মেলন :**

৮ ও ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'। দুদিনের শিল্প সম্মেলন শেষে রাজ্যের ঝুলিতে এসেছে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব। গত বছরের তুলনায় তিন শতাংশ বেশি।

উল্লেখ্য, এই প্রস্তাবের অনেকটাই এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার সৌজন্যে। যেমন, খননের ক্ষেত্রে যে ২৩৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে রাজ্য, তার মধ্যে দেউচা পাচামি কয়লা প্রকল্প বাবদ ২২০০০ কোটি টাকা এখনও পরিকল্পনা স্তরেই রয়েছে। এবং সেই অঙ্কও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ছয়টি রাজ্য মিলিয়ে ভাগ হবে। বাকি ৩৩০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা কুদ্রেমুখ আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ৮৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনের শেষ দিনেই পরের বছরের 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর দিন ঘোষণা করে দেন। ২০১৭ সালের ২০ ও ২১ জানুয়ারি এই সম্মেলন হবে।

● **শালবনিতে জিন্দলদের সিমেন্ট প্রকল্পের শিলান্যাস :**

১১০০ কোটি ডলারের শিল্পগোষ্ঠী জেএসডব্লিউ পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ৮০০ কোটি টাকা লগ্নিতে এক সিমেন্ট কারখানা তৈরি করছে। ৬ জানুয়ারি শালবনিতে জিন্দলদের সিমেন্ট প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দল। সেখানেই সিমেন্ট কারখানার পরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও রং কারখানা গড়ার পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন সজ্জন জিন্দল। সব মিলিয়ে রাজ্যে ১০ হাজার কোটি টাকা লগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানান, শালবনিতে সিমেন্ট কারখানা এক বছরের মধ্যে চালু হবে। তাঁর দাবি, এই কারখানায় বছরে ২৪ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপাদন করা হবে। আর কারখানা পুরোদমে চালু হয়ে যাওয়ার পরে উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শালবনিতে ইস্পাত প্রকল্প গড়ার জন্য চার হাজারের বেশি একর জমি নিয়েছিলেন জিন্দলরা। পশ্চিমবঙ্গে আকরিক লোহার অভাব ও ইস্পাতের বাজার খারাপ হওয়ার কারণে ৩৫ হাজার কোটি টাকার সেই প্রকল্প আপাতত হিমঘরে।

● **হলদিয়া পেট্রোকেমের শেয়ার হস্তান্তর রাজ্যের :**

৫ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের দপ্তরে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এর পরিচালন পর্ষদের বৈঠক হয়। এ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সরকারের শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ হল। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই হস্তান্তরের আর্জি পেশ হলেও পরিচালন পর্ষদের সিলমোহর এ দিনের বৈঠকে পড়ল। এবং সেই সূত্রেই অন্যতম প্রধান অংশীদারের তকমা ঝেড়ে ফেলল রাজ্য সরকার। পরিচালন পর্ষদে রাজ্য সরকারের চার প্রতিনিধির মধ্যে তিনজন ইস্তফা দিয়েছেন। সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে থেকে গেলেন শুধুমাত্র নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃষ্ণ গুপ্ত।

উল্লেখ্য, এক দশকের উপর চলতে থাকা বিবাদে যবনিকা টেনে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের রাশ চ্যাটার্জি গোষ্ঠীরই হাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারের তকমা নিয়েই সংস্থার ভার নিচ্ছে তারা।

● **চা শিল্প বাঁচাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সীতারামনের উদ্যোগ :**

উত্তরবঙ্গ সফরে আসেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ৪ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে চা বাগান মালিক, শ্রমিক—সব পক্ষের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে দুটি বৈঠকেই ছিলেন বন্ধ চা বাগান নিয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্য শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগান খুলতে এবং এই শিল্পে অচলাবস্থা কাটাতে চার পদক্ষেপের কথা বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর চার পদক্ষেপ হল : (১) কোনও বাগান বন্ধ হলেই সেটি চালু করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) চা বাগান শ্রমিকদের জন্য দ্রুত ন্যূনতম মজুরি চালু করতে উদ্যোগী হতে হবে রাজ্য সরকারকে। (৩) শ্রমিকরা বর্তমানে দৈনিক ১২২ টাকা মজুরি পান। সঙ্গে চাল, গম-সহ মোট ১০৯ টাকা মূল্যের সুবিধা। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ওই ১০৯ টাকাও মজুরির সঙ্গে নগদে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (৪) বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকরা কী পাচ্ছেন এবং বাস্তব পরিস্থিতি কী, তা খতিয়ে দেখতে প্রতিটি জেলায় একটি করে কমিটি গঠন করা হবে।

দেশ-বিদেশে উত্তরবঙ্গের চায়ের কদর আরও বাড়াতে কীটনাশকের ব্যবহার খতিয়ে দেখে স্থানীয় স্তরেই তার গুণগতমান পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশেষে তৈরি হয়েছে টি-বোর্ডের হাত ধরে। ৫ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ওই পরীক্ষাগারটি উদ্বোধন করেন। নিউ জলপাইগুড়ি 'টি পার্ক'-এ ৭ কোটি টাকা খরচে তৈরি আধুনিক পরীক্ষাগার চালু হয়েছে।

অর্থনীতি

● **ঘাটতি প্রথম নয় মাসের লক্ষ্যের ৮৮ শতাংশ :**

চলতি (২০১৫-১৬) আর্থিক বছরের প্রথম নয় মাসে রাজকোষ ঘাটতি পৌঁছেছে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৮৮ শতাংশে (৪.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা)। যেখানে আগের অর্থবর্ষের একই সময় তা ছুঁয়ে ফেলেছিল ১০০.২ শতাংশ। সরকারি সূত্রের দাবি, আয় বাড়িয়ে খরচ সামলানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্র যে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, তারই প্রতিফলন এটি। এবারের বাজেটে চলতি অর্থবর্ষে সরকারের আয় ও ব্যয়ের এই ঘাটতিকে ৫.৫৫ লক্ষ কোটি টাকায় বেঁধে রাখার লক্ষ্য স্থির করেছিলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। বছর শেষ হতে এখনও মাস দুয়েক বাকি। সেক্ষেত্রে লক্ষ্যপূরণ হবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল।

মূলত কর আদায় বাড়িয়েই নিয়ন্ত্রণে রাখা গিয়েছে রাজকোষ ঘাটতিকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কর থেকে নয় মাসে কেন্দ্রের ঘরে

এসেছে ৬.২২ লক্ষ কোটি টাকা (৬৭.৬ শতাংশ)। পুরো বছরের লক্ষ্য ৯.১৯ লক্ষ কোটি।

- **ভারত-সহ চার উন্নয়নশীল দেশের আইএমএফ-এ ভোট বাড়ল :**

সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ) জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সেখানে উন্নয়নশীল দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে। ভোট দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ছে ৬ শতাংশেরও বেশি। প্রথম দশে জায়গা পাচ্ছে ভারত, চীন, ব্রাজিল এবং রাশিয়া। যা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে তাদের দাবি। আইএমএফ কর্ণধার ক্রিস্টিন ল্যাগার্দের মতে, এতে উন্নয়নশীল দুনিয়ার স্বার্থ আরও ভালোভাবে সুরক্ষিত হবে। তবে এর দৌলতে আইএমএফ-এর তহবিলের মাপও বেড়ে হবে ৬৫,৯০০ কোটি ডলার। কারণ, ভোট বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগের তুলনায় বেশি অর্থ জোগাতে হবে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে।

দীর্ঘদিন আইএমএফে এই সংস্কারের জন্য জোরালো সওয়াল করে এসেছে ভারত। এ বিষয়ে যুক্তি ছিল, বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্রুত গুরুত্ব বাড়ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অর্থ ভাণ্ডারে তাদের গুরুত্ব ও প্রতিনিধিত্ব বাড়া উচিত। এই যুক্তি আগেই মেনে গত ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বর উন্নয়নশীল দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছিল আইএমএফ-এর পরিচালন পর্ষদ। কিন্তু তার পরেও তা নিয়ে চলছিল টালবাহানা। মার্কিন কংগ্রেসে শেষমেশ এই প্রস্তাব পাশ হয় গত বছর। আর এই সব কিছুর পরে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন পর্ষদে দুটি আসন উন্নয়নশীল দুনিয়ার জন্য ছেড়ে দিচ্ছে ইউরোপ। ভোট দেওয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে ৬ শতাংশের বেশি।

- **ভারতীয় অর্থনীতিকে ভরসা দিল এস অ্যান্ড পি :**

ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই বলে ভরসা দিল আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর্স (এস অ্যান্ড পি)। বিশ্ব বাজারে মন্দার কারণে ভারতের রপ্তানি কমছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্বস্তির দিকটি উপেক্ষা করলে চলবে না বলে মন্তব্য করেছে সংস্থা। মোটের উপর বিশ্ব অর্থনীতির ঝড়-ঝাপটা কিছুটা এড়িয়েই যে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ভারতের রয়েছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে এই আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই সংস্থা ২৬ জানুয়ারি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বাইরে থেকে ভারতের অর্থনীতির উপর তেমন কোনও জোরালো ধাক্কা আসার সম্ভাবনা কম। তার জন্য দুটি কারণ চিহ্নিত করেছে তারা, যেগুলি হল : দেশের মধ্যেই বিশাল বাজার ও সরকারি খরচের বহর।

ভারতের শেয়ার বাজার বিদেশি আর্থিক সংস্থার লগ্নির উপর কিছুটা নির্ভর করলেও ওই লগ্নি বেরিয়ে গেলে বড় বিপদের মুখোমুখি হতে হবে না বলে কুরি আশাবাদী। এস অ্যান্ড পি রেটিং সার্ভিসেস ইন্ডিয়া-র বিশ্লেষক কিরণ কুরির মতে, নিজের দেশের বিস্তৃত বাজারের কারণেই বিদেশি লগ্নির আসা-যাওয়ার ঝুঁকির আঁচ এখানে তেমন লাগে না।

চলতিখাতে বিদেশি মুদ্রার লেনদেন ঘাটতি (বিদেশি মুদ্রা আয়-ব্যয়ের ফারাক) ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ের ১.৪ শতাংশ ছাড়াবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছে এস অ্যান্ড পি। আগামী ২০১৮ সাল পর্যন্ত তা একই রকম থাকবে বলেও মনে করছে এই মূল্যায়ন সংস্থা।

- **ডব্লিউইএফ-এর গোষ্ঠীতে রঘুরাম রাজন :**

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এর একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন। আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে সমীক্ষা করাই এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই শেষ হওয়া বার্ষিক বৈঠকে ডব্লিউইএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ভারতের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিদের এ ধরনের গোষ্ঠীর সদস্য করা হবে। বিশ্বজুড়ে আর্থিক উন্নয়নের পথে বাধা চিহ্নিত করে তার সমাধান বলে দেবে এই গোষ্ঠী।

- **ডাক বিভাগের এটিএম ও কোর ব্যাংকিং :**

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত নিজের খোলনলচে বদলানোর পথে পা বাড়িয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ। যার অঙ্গ হিসেবে মার্চের মধ্যেই দু-দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্য তাদের। দেশে ১০০০টি এটিএম খুলে ফেলা। এবং শহরাঞ্চলের ২৫ হাজার ডাকঘরকে কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের আওতায় আনা। ঠিক যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করে ব্যাংকগুলি। অর্থাৎ এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তৈরি করা এমন এক সংযোগ ব্যবস্থা, যেখানে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট যে-ডাকঘরেই খোলা হোক না-কেন, তার কাজকর্ম ও পরিষেবা গ্রহণের সুবিধা মিলবে কোর ব্যাংকিং-এর আওতায় থাকা যে-কোনও ডাকঘর থেকে।

ডাক বিভাগ সূত্রে খবর, কোর ব্যাংকিং সিস্টেম জানুয়ারির মধ্যেই ১২,৪৪১টি ডাকঘরে চালু হয়েছে। খুলেছে তাদের ৩০০টি এটিএম-ও। আধুনিকীকরণের গতি বাড়িয়ে এবার এই অর্থবর্ষের মধ্যে দুই ক্ষেত্রে সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো জায়গায় নিয়ে যেতেই এই উদ্যোগ। গ্রামাঞ্চলে আছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডাকঘর। সূত্রের দাবি, একই লক্ষ্যে কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের ধাঁচে সেখানেও আনা হবে সৌরশক্তিচালিত বায়োমেট্রিক যন্ত্র মারফত গ্রাহকের পরিচয় নির্ধারণের ব্যবস্থা। তবে সেই ব্যবস্থা আনতে ২০১৭ সালের মার্চ গড়াবে।

- **অনলাইনেও রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম মেটানোর ব্যবস্থা :**

এখন থেকে বুকিং-এর সময়েই অনলাইনে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম মেটাতে পারবেন ক্রেতা। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ২৪ জানুয়ারি দেশজুড়ে এই পরিষেবা চালু করলেন। www.mylpg.in ওয়েবসাইটে গিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন ক্রেতা। ১৩টি ভারতীয় ভাষার পরিষেবাটি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, আইভিআরএস, ওয়েব ও এসএমএস মারফত গ্যাস বুকিং করা যায়।

- **হরিয়ানার শিল্প-পার্কে চীনা সংস্থার ৬৮ হাজার কোটির লগ্নি প্রস্তাব :**

চীনের দালিয়ান ওয়ান্দাগোষ্ঠী জানাল, হরিয়ানায় শিল্প-পার্ক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক) গড়তে ১০০০ কোটি ডলার (৬৮ হাজার কোটি

টাকা) লগ্নি করবে তারা। ওই পার্ক তৈরির জন্য ২৩ জানুয়ারি চীনা আটটি সমঝোতাপত্র (মউ) সই করেছে হরিয়ানা সরকার। ওয়ান্দাগোষ্ঠী ছাড়াও চুক্তি সই হয়েছে চায়না ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এবং জেটিই কর্পোরেশনের সঙ্গে। এছাড়া, ওই রাজ্যে ১০০ কোটি ডলার (৬,৮০০ কোটি টাকা) ঢালার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীনের ১০০টিরও বেশি ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি সংস্থা।

উল্লেখ্য, এর দিন সাতেক পরেই অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি লগ্নির খোঁজে এ রাজ্যে আসেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। এবং তারপর দেশ-বিদেশ থেকে হরিয়ানার লগ্নি টানতে ৭ ও ৮ মার্চ গুরগাঁওয়ে সম্মেলন (হ্যাপেনিং হরিয়ানা—গ্লোবাল ইনভেস্টর্স সামিট : ২০১৬) আয়োজন করছেন তিনি।

দাভোসে বিশ্ব আর্থিক সম্মেলনের ফাঁকে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর রঘুরাম রাজন বলছিলেন, এই মুহূর্তে ভারতের অর্থনীতির অন্যতম ভালো দিক লগ্নি টানতে রাজ্যগুলির মধ্যে মারকাটারি প্রতিযোগিতা। এ রাজ্যে বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে ওই একই কথা বলে গিয়েছেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও।

- **শোধনাগার গড়বে চার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা :**

ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি), ভারত পেট্রোলিয়াম (বিপিসিএল) ও হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়ামের (এইচপিসিএল) যৌথ উদ্যোগে তেল শোধনাগার তৈরির পরিকল্পনার কথা গত মাসেই জানিয়েছিলেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সেই ভাবনা অনেকটাই এগিয়েছে বলে এবার ইঙ্গিত দিলেন আইওসি-র অন্যতম শীর্ষ কর্তা। তিনি জানান, ওই তিন রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার পাশাপাশি এতে শামিল হতে পারে আর এক নবরত্ন সংস্থা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়াও। সব ঠিকঠাক চললে খুব শীঘ্রই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে তাঁদের আশা।

আইওসি-র ডিরেক্টর (রিফাইনারিজ) সঞ্জীব সিংহের মতে, তিন সংস্থা হাত মিলিয়ে এগোলে প্রত্যেকের দক্ষতাকে কাজে লাগানো যাবে। সেই সঙ্গে সহজ হবে প্রকল্পের খরচ জোগাড় করাও। শুধু তেল শোধনাগার নয়, পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প গড়ারও ভাবনা আছে তিন সংস্থার। পারাদীপে শোধনাগারের পাশাপাশি পেট্রোকেম প্রকল্পও চালু করছে আইওসি। সেই দক্ষতা নয়া পরিকল্পনায় কাজে লাগাতে চায় তারা।

যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পের সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে মহারাষ্ট্র এগিয়ে বলে জোর জল্পনা বাজারে। তা মেনেছেন সিংহও। তাঁর মতে, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বাজার ধরতে পশ্চিম ভারতে পা রাখা জরুরি। পশ্চিম এশিয়া থেকে অশোধিত তেলের সরবরাহও সেখানে সহজ। এই দুই কারণেই তাঁরা মহারাষ্ট্রকে প্রাথমিক বাছাই পর্বে এগিয়ে রাখছেন।

- **চালু হবে পারাদীপ শোধনাগার :**

অবশেষে পারাদীপে চালু হতে চলেছে ইন্ডিয়ান অয়েলের (আইওসি) প্রায় সাড়ে ৩৪ হাজার কোটি টাকার আধুনিক ও বৃহত্তম শোধনাগারটি। ১৪ বছর আগে প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি। ৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আনুষ্ঠানিকভাবে এটির উদ্বোধন করার কথা। এই প্রকল্পের হাত ধরে পেট্রোরসায়ন শিল্পেও পর্যায়ক্রমে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা লগ্নির পরিকল্পনা রয়েছে ৪.৫১ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা করা এই নবরত্ন সংস্থাটির।

২৪ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও-এর আমলে প্রথম প্রস্তাবিত এই শোধনাগারটি গোড়া থেকেই নানা বিঘ্নের মুখে পড়েছে। দেরির জন্য প্রকল্পের খরচও বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪ হাজার ৫৫৫ কোটি টাকা।

সাধারণভাবে অশোধিত তেল থেকে ১৮-২০ শতাংশ এলপিজি বা রান্নার গ্যাস মেলে। সংস্থার কর্তাদের দাবি, সম্পূর্ণভাবে তাঁদের দেশীয় প্রযুক্তি 'ইন্ডম্যাক্স'-এর (যা আইওসি-র পেটেন্ট নেওয়া) জন্য এই শোধনাগারে পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত রান্নার গ্যাস পাওয়া সম্ভব হবে।

পেট্রোরসায়ন শিল্পে ৭ হাজার কোটি টাকা প্রস্তাবিত লগ্নির মধ্যে ৩১৫০ কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে প্লাস্টিক শিল্পের জন্য পলিপ্রপিলিন কারখানায়। ইন্ডম্যাক্স পদ্ধতিতে যে 'ক্র্যাকড এলপিজি' মিলবে, তা থেকেই তৈরি হবে ওই পলিপ্রপিলিন।

- **পৃথিবীর বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে মধ্যপ্রদেশে :**

পৃথিবীর বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র (৭৫০ মেগাওয়াট) গড়তে বিশ্ব ব্যাংকের শাখা আইএফসি-র সঙ্গে চুক্তি করল মধ্যপ্রদেশ। লগ্নি ৪৫০০ কোটি টাকা। রেলের উন্নয়ন তহবিলেও বিশ্ব ব্যাংক হবে প্রধান লগ্নিকারী, জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু।

- **চুরি ঠেকাতে কোল ইন্ডিয়ায় নতুন প্রযুক্তি :**

কয়লা চুরি আটকাতে এবার তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে কোল ইন্ডিয়া। যার আওতায় প্রতিটি কয়লা বহনকারী ট্রাকে জিপিএস নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি। পাশাপাশি, খনিতে ঢোকা-বেরোনোর গেট-সহ বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি নজরদারি, খনির চারপাশে বিদ্যুৎবাহী কাঁটাতার, খনন সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্যভাণ্ডার তৈরি-সহ নানা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোল ইন্ডিয়া-র সিএমডি সুতীর্থ ভট্টাচার্য বলেন, কাজে দক্ষতা এনে উৎপাদন বাড়াতেই এই পদক্ষেপ।

- **২০২০ থেকেই 'ভারত স্টেজ সিক্স' :**

প্রত্যাশামতোই ভারত স্টেজ ফাইভ-কে সরাসরি পাশ কাটিয়ে, ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে দেশে গাড়ির দূষণ সংক্রান্ত মাপকাঠি ভারত স্টেজ সিক্স চালুর কথা জানাল কেন্দ্র। ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকড়ীর পৌরোহিত্যে আন্তঃমন্ত্রক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গাড়ি দূষণ কমাতে এবং পরিবেশ বাঁচাতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি। এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারী শিল্পমন্ত্রী অনন্ত গীতে, তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভেদকর প্রমুখ।

কেন্দ্রের স্থির করা লক্ষ্য অনুসারে, ২০১৭-এর ১ এপ্রিলের মধ্যে দেশজুড়ে ভারত স্টেজ ফোর-এর মাপকাঠি চালু হওয়ার কথা। বর্তমানে নির্দিষ্ট কয়েকটি শহরে তা চালু রয়েছে। গডকড়ী বলেন,

নতুন মাপকাঠি মেনে উৎপাদন করতে তেল সংস্থাগুলিকে ৩০ হাজার কোটি টাকা লগ্নির পথে হাঁটতে হবে। পাশাপাশি, গাড়ি সংস্থাগুলিকেও এক্ষেত্রে সহায়তা করতে আহ্বান জানান তিনি।

- **বেসরকারি ব্যাংকের জন্য নতুন সূচক :**

ব্যাংক শিল্পের জন্য নতুন একটি সূচক চালু করল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)। এই 'নিফ্‌টি প্রাইভেট ব্যাংক ইন্ডেক্স'-এর আওতায় দেশের প্রথম সারির ১০টি বেসরকারি ব্যাংককে রাখা হয়েছে। এনএসই-তে ইতিমধ্যেই 'নিফ্‌টি ব্যাংক' এবং 'নিফ্‌টি পিএসইউ ব্যাংক' নামে দুটি সূচক রয়েছে। নতুনটি শুধু বেসরকারি ব্যাংক নিয়ে।

এনএসই-র কর্পোরেট কমিউনিকেশন্স কর্তা অরিন্দম সাহার মতে, এর ফলে দেশের বেসরকারি ব্যাংকিং ক্ষেত্রের হাল কেমন, সে সম্পর্কে আলাদা করে ধারণা পাবেন লগ্নিকারী। এখন যে দুটি সূচক রয়েছে, তার মধ্যে নিফ্‌টি ব্যাংক ইন্ডেক্সে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে. নিফ্‌টি পিএসইউ ব্যাংকে আছে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকের আলাদা সূচক ছিল না।

- **কৌশিক বসু ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির গতি নিয়ে আশাবাদী :**

নতুন বছরেও বজায় থাকবে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির গতি। সম্প্রতি এই আশার কথা শোনা গেল বিশ্ব ব্যাংকের মুখ্য আর্থিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু-র মুখে। তাঁর আশা, ২০১৬ সালেও ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি হবে ৭ থেকে ৭.৫ শতাংশের মধ্যে। তা হলে অর্থনীতির মাপকাঠিতে সারা বিশ্বের বড় দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে থাকবে ভারতই।

অক্টোবর পর্যন্ত চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশ হবে বলেই পূর্বাভাস করেছিল বিশ্বব্যাংক। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৭.৮ শতাংশ এবং তার পরের বছর ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি হবে বলেও জানিয়েছিল তারা।

এদিকে কৌশিকবাবু ভারতের অর্থনীতি নিয়ে আশার কথা শোনালেও, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে এখনই অতটা প্রত্যাশা করতে নারাজ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের (আইএমএফ) কর্ণধার ক্রিস্টিন ল্যাগার্দে। বরং তাঁর মতে, ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা গড়াবে ঢিমেতালেই। বৃদ্ধির হার হবে হতাশাজনক। এমনকী মাঝারি মেয়াদেও তা পুরোদস্তুর ছন্দে ফিরবে কি না, সে বিষয়ে সন্দিহান তিনি। উল্লেখ্য, অক্টোবরে আইএমএফ-এর পূর্বাভাস ছিল ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে বৃদ্ধি হবে ৩.৬ শতাংশ।

ল্যাগার্দে মনে করছেন, নতুন বছরে বিশ্ব অর্থনীতির পুরোদস্তুর ঘুরে দাঁড়ানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে মূলত দুটি বিষয়—(১) মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদ বৃদ্ধি। (২) চীনা অর্থনীতির নড়বড়ে দশা। কৌশিকবাবুর মতে অবশ্য, মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ সুদ বাড়ানোর খুব একটা প্রভাব পড়বে না ভারতের অর্থনীতিতে। সাময়িকভাবে কিছু লগ্নি চলে গেলেও, তার প্রভাব হবে খুবই সামান্য।

- **ক্ষুদ্র লগ্নিকারীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে নিয়ম পরিবর্তন সেবি-র :**

এখন থেকে নতুন শেয়ার ছাড়ার নাম করে সাধারণ লগ্নিকারীদের টাকা আর আটকে রাখতে পারবে না কোনও সংস্থা। শুধু তাই নয়, নতুন শেয়ার কেনার আবেদন করার শেষ তারিখের ৬ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানিয়ে দিতে হবে তাঁর নামে শেয়ার মঞ্জুর করা হবে কি না। শেয়ারবরাদ্দ হলে বিনিয়োগকারীকে জানাতে হবে তার সংখ্যাও। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি-র নির্দেশে নতুন বছরের প্রথম দিন (১ জানুয়ারি) থেকেই চালু হচ্ছে এই নিয়ম।

নতুন ব্যবস্থায় লগ্নিকারীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে আগের মতো আর চেক জমা দিতে হবে না। জানাতে হবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর-সহ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য। এর ফলে সংস্থাগুলি চেক ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিতে পারবে না। কেবল লগ্নিকারীর দেওয়া ব্যাংকের তথ্যের ভিত্তিতে শেয়ারের দামবাবদ টাকা আটকে বা 'ব্লক' করে রাখতে পারবে। শেয়ার মঞ্জুর হলে তবেই তার দাম, ব্লক করা ওই টাকা থেকে কেটে নিতে পারবে। যদি আবেদন করা পুরো শেয়ার মঞ্জুর না হয়, তাহলে যে কটি শেয়ার লগ্নিকারী পাবেন, কেবল তার দামটুকুই কাটতে পারবে সংস্থা। বাকি টাকা লগ্নিকারীর ব্যাংকেই থেকে যাবে। নতুন ব্যবস্থায় 'ব্লক' বা আটকে থাকা টাকার উপর যথারীতি সুদ পেতে থাকবেন লগ্নিকারী। এবার ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে সুবিধা করে দিতেই নতুন নিয়ম চালু করল শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক।

- **৭ মাসে প্রথম উৎপাদন কমল পরিকাঠামো ক্ষেত্রে :**

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত পরিসংখ্যান জানাল, নভেম্বর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি তো দূর অস্ত, বরং তা সরাসরি কমেছে ১.৩ শতাংশ। ওই শিল্পে এমন সংকোচন এপ্রিল মাসের পরে এই প্রথম। কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, শোধিত পেট্রোপণ্য, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট এবং বিদ্যুৎ—এই আট শিল্প রয়েছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবে শিল্প উৎপাদন সূচকেও এর গুরুত্ব অনেকখানি। প্রায় ৩৮ শতাংশ।

আলোচ্য মাসে পরিকাঠামো বৃদ্ধিকে টেনে নামিয়েছে অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ইস্পাত এবং সিমেন্টের উৎপাদন কমে যাওয়া। কয়লা, শোধিত পেট্রোপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু তাও একেবারে ঢিমেতালে। এই সব কিছুর মধ্যে একমাত্র আশার আলো সার শিল্প। উৎপাদন বেড়েছে ১৩.৫ শতাংশ। যেখানে গত নভেম্বরে তা সংকুচিত হয়েছিল ২.৮ শতাংশ।

২০১৪ সালের নভেম্বরে পরিকাঠামোয় বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৫ শতাংশ। সেখানে এবার ওই ক্ষেত্রে উৎপাদন সরাসরি কমেছে ১.৩ শতাংশ। গত এপ্রিলে ০.৪ শতাংশ সংকোচনের পরে এই প্রথম। এপ্রিল থেকে নভেম্বর—এই ৮ মাসেও পরিকাঠামোয় বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২ শতাংশ। গত বছর তা ছিল ৬ শতাংশ।

- **নগদ ৫০ হাজারে জানাতেই হবে প্যান :**

হোটেল বিল বা বিদেশ যাত্রার খরচ (যেমন, বিমান-টিকিটের দাম) ৫০ হাজার টাকা ছাড়ালে, তা নগদে মেটাতে প্যান নম্বর

জানাতেই হবে ১ জানুয়ারি থেকে। তা দিতে হবে বাজারে নথিভুক্ত নয়, এমন সংস্থার এক লক্ষ টাকার বেশি শেয়ার কিনতে। গয়না কেনা-সহ বাকি লেনদেন দু লক্ষ ছুঁলেও প্যান নম্বর জমা করতেই হবে। এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, মেয়াদি আমানতের জন্য একলপ্তে ৫০ হাজার টাকার বেশি ব্যাংক, ডাকঘর কিংবা ব্যাংক নয় এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা করলে, দিতেই হবে প্যান নম্বর। একই নিয়ম প্রযোজ্য ওই সব আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরে ৫ লক্ষ টাকা জমা দিলে। প্রধানমন্ত্রী জন-ধন প্রকল্প ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্যও প্যান জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

প্যান কার্ড নেই, এমন কেউ আর্থিক লেনদেনের সময় নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে, কড়া শাস্তি হবে তাঁর। দিতে হবে মোটা জরিমানা। হতে পারে সাত বছর পর্যন্ত জেলও।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

- **১৫০০ বছরের কঙ্কালে নকল পা :**

বছর তিনেক আগে দক্ষিণ অস্ট্রিয়ার হেমাবার্গ শহরে মাটি খুঁড়ে মেলে এক ব্যক্তির কবর। তখন অবশ্য কঙ্কাল নিয়ে বিশেষ নাড়াঘাটা হয়নি। কাঠের নকল পায়ের বিষয়টিও চোখ এড়িয়ে যায় নৃতত্ত্ববিদদের। কিন্তু সম্প্রতি নতুন করে গবেষণা শুরু হয়। দেখা যায় মধ্যবয়সি ব্যক্তির কঙ্কালের বাঁ পায়ের পাতা নেই। বদলে সেখানে রয়েছে একটি লোহার রিং আর কয়েক টুকরো কাঠ। গবেষকরা জানাচ্ছেন, তাঁরা রেডিওগ্রাফি ও সিটি-স্ক্যান করে দেখেন জীবদ্দশায় ওই ব্যক্তি কোনওভাবে জখম হয়েছিলেন। সম্ভবত তাতেই তিনি পা হারান। সেই ঘটনায় কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়নি। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরীক্ষায় তা ধরা পড়েছে, জানাচ্ছেন নৃতত্ত্ববিদরা।

অস্ট্রিয়ান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের গবেষক সাবিন ল্যাডস্ট্যাটারের দাবি ওই নকল পা নিয়ে অন্তত দু বছর সুস্থভাবে বেঁচেছিলেন তিনি। বায়োআর্কিওলজিস্ট মিশেলা বিন্ডারও একই সুরে জানিয়েছেন, সেই অস্ত্রোপচার মোটেই সাধারণ ছিল না। কিন্তু তাঁকে যে বাঁচানো গিয়েছিল, সেটাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটা বিস্ময়।

অস্ট্রিয়ান আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ওই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'প্যালিওপ্যাথোলজি' পত্রিকায়। জানানো হয়েছে, সম্ভবত এই কাঠের পায়ের মালিকই ইউরোপে নকল পা প্রতিস্থাপনের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন।

- **এ বছরে পাঁচটি গ্রহণ, দুটি দেখা যাবে ভারত থেকে :**

এ বছরে একেবারে পাঁচটা গ্রহণ দেখা যাবে, আর এর মধ্যে দুটি গ্রহণ দেখতে পাওয়া যাবে ভারত থেকে। ৯ মার্চে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। ২৩ মার্চে রয়েছে একটি চন্দ্রগ্রহণ। ১৮ আগস্টে রয়েছে আরও একটি চন্দ্রগ্রহণ এবং ১ সেপ্টেম্বর রয়েছে চন্দ্রগ্রহণ। এগুলির কোনওটিই এ দেশ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড় চন্দ্রগ্রহণ হবে ১৬ সেপ্টেম্বর। আর এটার সাক্ষী থাকবেন দেশবাসী।

- **কচ্ছে ডায়নোসরের ডানার জীবাশ্ম :**

ফের গুজরাতে মিলল ডায়নোসরের দেহের জীবাশ্ম। কচ্ছের লোদাই এলাকায় এক ডানার ফসিল পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ওই এলাকাতে থাকত দশ মিটার লম্বা তৃণভোজী এই ডায়নোসরগুলি। গত ১৯ জানুয়ারি রাজস্থান ও কচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এবং জার্মানির এক অধ্যাপক এই ডানাটি খুঁজে পান। ওই এলাকা থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ডায়নোসরের ফসিল উদ্ধার হল। এর আগে একটি অন্য প্রজাতির ডায়নোসরের ফসিল উদ্ধার হয়।

গবেষকরা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া ডানার ফসিলটি ১৩ লক্ষ কোটি বছর আগের। এর আগে যে পায়ের হাড়টি উদ্ধার হয়েছিল সেটি প্রায় ১৬ কোটি বছর আগের ছিল। ডানার ফসিলটি ঠিক কোন প্রজাতি ডায়নোসরের তা নিশ্চিত করতে জার্মানিতে গবেষণার জন্য পাঠানো হয়েছে।

- **সবচেয়ে বড় মৌলিক সংখ্যা :**

'$2^{74,207,281} - 1$'—এটি ২২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮ হাজার ৬১৮ অঙ্কের একটি সংখ্যা। এ পর্যন্ত জানা এটিই বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল মিসৌরির অধ্যাপক কার্টিস কুপার এটি আবিষ্কার করেছেন গত ৭ জানুয়ারি।

তিন বছর পর আরও একটি মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার হল অঙ্কের দুনিয়ায়। এর আগে শেষ 'বৃহত্তম' মৌলিক সংখ্যা আবিষ্কার হয়েছিল ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসেই।

ইউক্লিড প্রমাণ করে গিয়েছিলেন, মৌলিক সংখ্যার কোনও শেষ নেই। সেই অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যার আবিষ্কারের দৌড়ে বহু কাল ধরে মেতে আছে মানুষ। সেই অসীমের দৌড়ে আরও এক ধাপ এগোনো গেল।

- **দেশের পঞ্চম ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট মহাকাশে :**

দেশের পঞ্চম ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাল ভারত। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র সতীশ ধবন কেন্দ্র থেকে এই উপগ্রহ ২০ জানুয়ারি মহাকাশে পাঠানো হয়েছে। পিএসএলভি-সি৩১ মহাকাশযানে করে আইআরএনএসএস-১ই নামে এই উপগ্রহ মহাকাশে যাওয়ার ফলে আর কয়েক মাসের মধ্যে ভারত লক্ষ করতে পারবে নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থা। সর্বাধুনিক এবং ভারতের নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থা চালু করার আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার জন্য ইসরো-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ইসরো ২০১৩ সাল থেকেই দেশের নিজস্ব জিপিএস ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করে দেয়। এই ব্যবস্থাকে প্রায় ১০০ শতাংশ নিখুঁত করার জন্য মোট ৭টি উপগ্রহ পাঠাচ্ছে ভারত। বাকি দুটি আগামী দু মাসের মধ্যেই মহাকাশে স্থাপন করা হবে বলে ইসরো জানিয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তা, সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি, সীমান্ত সুরক্ষা-সহ নানা কাজে জিপিএস এখন অপরিহার্য। ভারত-সহ বিশ্বের

অধিকাংশ দেশকেই মার্কিন জিপিএস ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয়। দেশের মহাকাশবিজ্ঞানীদের দাবি, ৭টি উপগ্রহ নিয়ে যে জিপিএস ব্যবস্থা ভারত লঞ্চ করতে চলেছে কয়েক মাসের মধ্যেই, তা মার্কিন জিপিএস ব্যবস্থার সমান দক্ষ হবে।

● **প্রথম ফুল ফুটল মহাকাশে :**

মহাকাশে আগুন-রঙা 'জিনিয়া' ফোটালেন মার্কিন নভশ্চর স্কট কেলি। আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, সংক্ষেপে আইএসএস)-এ উদ্ভিদের প্রাণের স্পন্দন অবশ্য নতুন নয়। মানুষের বাসযোগ্য কৃত্রিম উপগ্রহটির ভেজ-ল্যাবে আগেও লেটুস জাতীয় সবজি ফলানো হয়েছে। কিন্তু ফুল নিয়ে গবেষণার প্রথমেই তাঁরা ধাক্কা খান। জল একটু বেশি হয়ে গেলেই পচন ধরতে শুরু করে গাছে। শেষে গাছগুলোকে বাঁচাতে ইলেকট্রিক ফ্যান লাগানো হয়। কিন্তু তাতে জলাভাবে (ডিহাইড্রেশন হয়ে গিয়ে) একের পর এক গাছ মরতে থাকে। বেঁচে যায় হাতেগোনা কয়েকটি গাছ। তারই মধ্যে একটিতে এখন ফুল ধরেছে। ৮ জানুয়ারি প্রথম কুঁড়ি আসে বলে দাবি করেন বিজ্ঞানীরা।

অবশেষে এই প্রথম ফুল ফুটল মহাকাশের ঘরে। স্বাভাবিকভাবেই গবেষণাগারে নতুন সদস্য আসার খবরে উচ্ছ্বসিত নাসা। উল্লেখ্য, আইএসএস-এর সবজি বাগানটা ২০১৪ সালেই তৈরি করা হয়েছিল। লেটুস চাষ সফল হওয়ার পর জিনিয়া লাগান গবেষকরা। ভবিষ্যতে মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েইছে। সেক্ষেত্রে খাবারের জন্য আর পৃথিবীর উপর নির্ভর করতে হবে না মহাকাশচারীদের। ফল-সবজি এ গ্রহ থেকে বয়েও নিয়ে যেতে হবে না। অভিযাত্রীরা নিজেরাই ফসল ফলাতে পারবেন ভিন গ্রহের মাটিতে।

● **বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপ :**

ভারতই একুশ শতকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারিগর হতে চলেছে। সেই টেলিস্কোপটি বানানো আর তা বসানোর জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেধা ও প্রযুক্তি-প্রকৌশলকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন ও জাপান। এই যুগান্তকারী প্রকল্পের কর্ণধারদের আশা, ২০২৩-২৪ সালের মধ্যেই ওই টেলিস্কোপটি চালু হয়ে যাবে। ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে মার্কিন মুলুকে হাওয়াই দ্বীপের মওনাকোয়ায় পাহাড়-চুড়োয় বসানো হচ্ছে ২০ তলা বাড়ির মতো উঁচু আর একটা ফুটবল মাঠের মতো চেহারার টেলিস্কোপ। যার লেন্সের ব্যাস ৩০ মিটার। লেন্সের ব্যাস ৩০ মিটার বলেই তার নাম দেওয়া হচ্ছে—'থার্টি মিটার টেলিস্কোপ' বা টিএমটি।

এর ফলে, ভিন গ্রহে প্রাণের সন্ধানে বিশ্বের বৃহত্তম টেলিস্কোপকে এবার স্বাধীনভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। বছরে অন্তত ৩৫টি রাত। মহাকাশ গবেষণার কাজে। এর মানে, টিএমটি-র দৌলতে ১৫ গুণ বেশি শক্তিশালী টেলিস্কোপে চোখ রেখে এবার ভিন গ্রহে প্রাণের সন্ধান করতে পারবেন ভারতের মহাকাশবিজ্ঞানীরা। ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ের এই প্রকল্পে ভারত দিচ্ছে এক হাজার তিনশো কোটি টাকা।

খেলার জগৎ

● **টেস্ট ও টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ভারত :**

অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিততেই আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এল ভারতীয় দল। এর কিছুদিন আগেই টেস্টে এক নম্বর স্থান দখল করে নিয়েছে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় টেস্ট দল। এবার টি-২০-তে সেরা মহেন্দ্র সিং ধোনীর দল।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারতেই র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এল ভারত। ২০১২ থেকেই শীর্ষস্থান দখলে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। পর পর হেরে এবার তিনে নেমে এল এত বছরের সেরারা। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চতুর্থ স্থানে পাকিস্তান। পাঁচে ইংল্যান্ড। ছয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। শ্রীলঙ্কা রয়েছে সাত নম্বরে। আটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নয়ে বাংলাদেশ। দশে রয়েছে জিম্বাবোয়ে।

এতদিন টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১২০। ক্যারিবিয়ানদের থেকে দু পয়েন্ট এগিয়ে। শ্রীলঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দলেরই রেটিং পয়েন্ট ১১৮। টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। পাঁচে নিউজিল্যান্ড, ছয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, সাতে পাকিস্তান, আটে অস্ট্রেলিয়া, নয়ে আফগানিস্তান ও দশে স্কটল্যান্ড।

উল্লেখ্য, প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপে ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতই। অস্ট্রেলিয়ায় এই সিরিজ জয়ের পর ভারত খেলবে এশিয়া কাপ। তার পর বিশ্বকাপ।

● **অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ :**

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে অ্যান্ডি মারেকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই রয় এমারসনের ছটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ট্রফি জয়ের রেকর্ডকে স্পর্শ করে ফেললেন নোভাক জকোভিচ। নিজের ১১তম গ্র্যান্ডস্লামটিও জিতে নিলেন তিনি। রজার ফেডেরার থেকে এখনও ছয়টি গ্র্যান্ডস্লাম পেছনে রয়েছেন তিনি। শেষ পাঁচটি ফাইনালের মধ্যে চারটিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। ২ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটের লড়াইয়ের শেষ সেটেই একটু চাপ সৃষ্টি করেছিলেন অ্যান্ডি মারে। যেটা গড়ায় টাইব্রেকারে। কিন্তু টাইব্রেকারেও বাজিমাত বিশ্বের এক নম্বরেরই।

৬-১-এ সহজেই প্রথম সেট জিতে নেন জকোভিচ। দ্বিতীয় সেট শেষ হয় ৭-৫-এ। শেষ সেটে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ৭-৬ (৭/৩) জিতলেন নোভাক জকোভিচ। এই নিয়ে ফাইনালে মারেকে চারবার হারালেন নোভাক জকোভিচ—২০১১, ২০১৩, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে। এর আগে ২০০৮-এ সঙ্গা ও ২০১২-তে রাফায়েল নাদালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন জকোভিচ।

● **অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন জার্মানির কের্বের :**

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে বিশ্বের সাত নম্বর অ্যাঞ্জেলিক কের্বেরের কাছে হারতে হল সেরেনা উইলিয়ামসকে। খেলার ফল ৬-৪, ৩-৬, ৬-৪। প্রসঙ্গত স্টেফি গ্রাফের পর কের্বেরই প্রথম জার্মান হিসাবে ২০ বছর পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন।

মেলবোর্নে ৩০ জানুয়ারি শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন না সেরেনা। সারা ম্যাচে এ দিন ৪৬টি আনফোর্সড এরর করেন ৩৪ বছরের মার্কিন তারকা। প্রথম সেট অনায়াসেই ৬-৪ সেটে কের্বের জিতে যান। দ্বিতীয় সেটে উইলিয়ামস দুবার জার্মান তারকার সার্ভিস ভেঙে সেট জেতেন ৬-৩ ফলে। কিন্তু নির্ণায়ক সেটে ফের ছন্দ হারান সেরেনা। ফের আনফোর্সড এররের বন্যা বইয়ে সেট হেরে বসেন ৬-৪ গেমে।

- **সিরিজ জিতে মেয়েদের আইপিএল-এর দাবি :**

মহেন্দ্র সিং ধোনীদের সিরিজ জয়ের দিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতেই সিরিজ জিতে টিম ইন্ডিয়ার মেয়েরাও ইতিহাস গড়লেন। এই নজির গড়ার পরই ঝুলন গোস্বামীদের দাবি মেয়েদের আইপিএল-এর।

অ্যাডিলেডে জয়ের পর ২৯ জানুয়ারি মেলবোর্নে টসে জিতে আগের দিনের মতোই প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন মিতালী রাজ। অধিনায়কের সিদ্ধান্ত যে একেবারে সঠিক তা প্রথম ওভারেই প্রমাণ করেন ঝুলন। বৃষ্টিবিঘ্নিত সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে ১০ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারান ঝুলন গোস্বামীরা। একই সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজ দখল করেন ২-০। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া ১৮ ওভারে ১২৫-এ অলআউট। ঝুলন পান দু উইকেট (২-১৮)। জবাবে ৭.৫ ওভারে ভারত ৫২ রান তোলার পর ফের বৃষ্টি শুরু হয়। পরিবর্তিত টার্গেট দাঁড়ায় ১০ ওভারে ৬৬ রান। ৯.১ ওভারে ৬৯-০ তুলে জিতে যায় ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এটাই ভারতের প্রথম অ্যাওয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়।

প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েদের টি-২০-র জন্য বিগ ব্যাশ লিগ রয়েছে। ইংল্যান্ডেও মেয়েদের ক্রিকেট সুপার লিগ শুরু হওয়ার কথা।

- **ব্যাডমিন্টনের জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ জিতল রাজ্যের ছাত্র :**

পটাশপুরের পালপাড়া গ্রামের রবীন্দ্রনাথ নায়েক সম্প্রতি রাজীব গান্ধী খেল অভিযানে অনূর্ধ্ব ষোলো বালক বিভাগে রাজ্যের হয়ে খেলতে গিয়ে জাতীয় স্তর থেকে সে ছিনিয়ে এনেছে ব্রোঞ্জ পদক।

যোগদা সৎসঙ্গ পালপাড়া বিদ্যালয়ের এই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর এই সাফল্য শুধুমাত্র খেলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়। তাকে লড়তে হয়েছে দারিদ্র, অপুষ্টি, ক্রীড়া সরঞ্জামের অভাব, প্রশিক্ষণহীনতা, ইনডোরে খেলার সুযোগ না পাওয়া-সহ অনেক কিছুর বিরুদ্ধে।

- **অস্ট্রেলীয় ওপেনে মহিলাদের ডাবলসে জয়ী হিঙ্গিস-মির্জা :**

২৯ জানুয়ারি অস্ট্রেলীয় ওপেনে মহিলাদের ডাবলসে সুইস সঙ্গী মার্টিনা হিঙ্গিসকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন সানিয়া মির্জা। ফাইনালে স্ট্রেট সেটে হারালেন চেক জুটি আন্দ্রিয়া হাভাকোভা ও লুসি হাদেকাকে। খেলার ফলাফল ৭-৬, ৬-৩।

প্রথম সেটে শীর্ষ বাছাই ইন্দো-সুইস জুটিকে বেশ খানিকটা বেগ দিয়েছিল চেক ডুও। তৃতীয় গেমে মার্টিনাদের সার্ভ ভেঙে এগিয়ে যায় তারা। পরের গেমেই লড়াইয়ে ফিরে আসেন হিঙ্গিস-মির্জা জুটি। তার পরের গেম ফের পকেটে পোরেন হাভাকোভারা। শেষ পর্যন্ত টাই-ব্রেকার পর্যন্ত গড়ায় প্রথম সেট। ৬২ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধে ৭-৬ গেমে ছিনিয়ে আনেন সানিয়ারা। দ্বিতীয় সেটে বিশ্বের এক নম্বর জুটির সামনে চেকরা উড়ে যান ৬-৩ গেমে।

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামটা ঝুলিতে পোরার সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের হ্যাটট্রিকটাও করে ফেললেন সানিয়া-মার্টিনা। ২০১৫ সালে উইম্বলডন, ইউএস ওপেন জেতার রেশটা বজায় রাখলেন ২০১৬-তেও। মাঝে অবশ্য ব্রিসবেন এবং সিডনি ইন্টারন্যাশনাল টাইটেলও জিতে নিয়েছেন। গত বসন্তে বিএনপি পরিবাস ওপেন জেতার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল জয়ের ধারাবাহিকতা। এর মধ্যেই ১২টা টাইটাল, টানা ৩৬টা ম্যাচ জেতা হয়ে গেছে।

- **সানিয়া, সাইনা ও দীপিকার পদ্ম সম্মান :**

টেনিস ও ব্যাডমিন্টনের দুই তারকা সানিয়া মির্জা ও সাইনা নেহওয়াল এবারের পদ্মভূষণ পুরস্কার পাচ্ছেন। আর পদ্মশ্রীর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তিরন্দাজ দীপিকা কুমারীকে। তিন জনই গত মরশুমে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন।

এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে সানিয়া। হায়দরাবাদি টেনিস তারকা গত বছর নয়টি খেতাব জেতেন সুইস তারকা মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে জুটিতে। তার মধ্যে দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। যার সুবাদে ডব্লুটিএ র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেও উঠে আসেন তিনি। মেলবোর্ন পার্কে অস্ট্রেলীয় ওপেনে ডাবলসে হিঙ্গিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামও জিতেছেন সম্প্রতি।

সাইনাও দুরন্ত ফর্মে ছিলেন গত মরশুমে। অল ইংল্যান্ড এবং বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন তিনি। পাশাপাশি খেতাব পান ইন্ডিয়ান ওপেন সুপার সিরিজ ও সৈয়দ মোদী গ্রাঁ প্রি গোল্ডে। আর দীপিকা তিরন্দাজি বিশ্বকাপে জেতেন রুপো। সঙ্গে বিশ্বকাপ স্টেজ টু ও এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ।

- **মালয়েশিয়া মাস্টার্স জয় সিন্ধুর :**

মালয়েশিয়ান মাস্টার্স জিতে নতুন বছর শুরু করলেন পিভি সিন্ধু। এর আগে ২০১৩ সালে এই ট্রফি জিতেছিলেন এই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা। দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রোঞ্জ জয়ী সিন্ধু বছরের শুরুটা করলেন সাফল্যের সঙ্গেই। স্কটল্যান্ডের ক্রিস্টি গ্লিমারকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে ২৩ জানুয়ারি সোনা জিতে নিলেন তিনি।

ফ্রেঞ্চ ওপেনে এই গ্লিমারের কাছেই ২০১৩ সালে হারতে হয়েছিল সিন্ধুকে। তবে এদিনের ম্যাচে ভারতীয় এই ব্যাডমিন্টন তারকা প্রমাণ করলেন কেন তাঁকে সেরাদের মধ্যে ধরা হয়। ৩২ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দিলেন না তিনি। ২১-১৫, ২১-৯-এ উড়িয়ে দিয়ে পঞ্চম গ্রাঁ প্রি সোনা জিতে নিলেন তিনি। গত নভেম্বরেই তিনি ম্যাকাও ওপেন গ্রাঁ প্রিতে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন।

বিবিধ সংবাদ

- **'অ্যান্টিপোড'-এ ১১ মিনিটে লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক :**

'কনকর্ড'-এর চেয়ে নাকি ১২ গুণ বেশি গতিতে লন্ডন থেকে

নিউইয়র্ক পৌঁছে যাবে ‘অ্যান্টিপোড’। কানাডিয়ান এক বিমান সংস্থার অন্যতম কর্তা চার্লস বোম্বার্ডিয়ারের দাবি, শব্দকে পকেটে পুরে ছোটো যাত্রীবাহী বিমান ‘অ্যান্টিপোড’ নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসের পাঁচ হাজার সাড়ে আটশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে ১২ মিনিটে (আকাশ-পথে এই লম্বা দূরত্বটা পেরোতে সময় লাগে এখন প্রায় ছয় ঘণ্টার কাছাকাছি)। সিডনিতে পৌঁছবে ৩২ মিনিটে। টোকিও পৌঁছতে সময় নেবে ২২ মিনিট, নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। মার্চের ২৪ তারিখেই প্রথম বারের জন্য লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক উড়ে যাবে ‘অ্যান্টিপোড’।

তবে নতুন বিমানটি ওই ভয়ংকর গতিতে ছুটতে পারবে মাত্র দশ জন যাত্রী নিয়ে। ওই বিমানের দুটি ডানায় থাকছে রকেট বুস্টার ইঞ্জিন। বিমানটি সর্বাধিক ৪০ হাজার ফুট উচ্চতা দিয়ে উড়ে যেতে পারবে। এর ফলে, যাতে বিমানটি অসম্ভব তেতে না যায়, সেজন্য নাসার বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যাতে নাক (নোজ) দিয়ে বাতাসে গরম হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে উড়ে যাবে বিমানটি। বিমানটি বানাতে খরচ হয়েছে ১৫ কোটি মার্কিন ডলার।

- **একই গ্রামে ৬১ জোড়া যমজ :**

দক্ষিণ-পশ্চিম ইউক্রেনের একটা গ্রাম ভেলিকায়া কোপানিয়া। মেরেকেটে হাজার চারেক মানুষ থাকেন। ২০০৪ সাল থেকে হঠাৎই যমজ শিশু জন্মের সংখ্যা বেড়ে যায়, জানাচ্ছেন স্থানীয় কাউন্সিলর মারিয়ানা সাভকা। তার পর থেকে প্রতি বছর অন্তত দুই বা তিন জোড়া যমজ শিশু জন্মে চলেছে এখানে। ৬১ জোড়া অর্থাৎ ১২২ জন যমজের হাত ধরে খুব শীঘ্রই এই গ্রামের নাম জায়গা করে নিতে চলেছে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে। এখনও কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আসেনি।

- **১১২ বছর বয়সে মারা গেলেন বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ :**

জাপানের নাগোয়া শহরে থাকতেন বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ ইয়াসুতোরো কোইদে। কয়েক দিন ধরে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। ১৯ জানুয়ারি ভোরে তাঁর হৃদযন্ত্র থেমে যায় চিরকালের মতো। ১১২ বছর বয়সে মারা গেলেন বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ।

জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালের ১৩ মার্চ। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে কয়েক বছর বাকি। এরোপ্লেন আবিষ্কার হয়নি। ইয়াসুতোরা যেদিন জন্মান, তার ঠিক ১০ দিন পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইট ভাইয়েরা প্রথম সফলভাবে আকাশে ওড়েন।

গত বছর আগস্ট মাসে ইয়াসুতোরাকে বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ বলে স্বীকৃত দেয় গিনেস বুক অব রেকর্ডস। দীর্ঘ জীবনের রহস্য কী? ইয়াসুতোরা বলেছিলেন—ধূমপান না করা, মদ না খাওয়া, কোনও কিছুতে বাড়াবাড়ি না করা আর আনন্দে জীবন কাটানো।

তবে ইয়াসুতোরা বিশ্বের প্রবীণতম পুরুষ হলেও, প্রবীণতম মানুষ ছিলেন না। এই নজির গত বছর থেকে ধরে রেখেছেন ১১৬ বছরের মার্কিন বৃদ্ধা সুসান মুশাট জোনস। ১ এপ্রিল ২০১৫ জাপানের মিসাও ওকাওয়া ১১৭ বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর, প্রবীণতমের শিরোপা মাথায় ওঠে সুসানের।

- **৭০ বছর পর ‘মাইন কাম্ফ’ এবার সটীক সংস্করণে :**

৭০ বছর পরে জার্মানিতে ফের প্রকাশিত হল ‘মাইন কাম্ফ’ (অর্থাৎ ‘আমার সংগ্রাম’)। গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ ফুরিয়েছে গত ৩১ ডিসেম্বর। আর ৯ জানুয়ারি থেকে নাৎসি-নায়ক অ্যাডলফ হিটলারের আত্মজীবনীর সটীক সংস্করণ দেশের ক্রেতারা সরাসরি দোকান থেকেই কিনতে পারবেন বলে জানিয়েছে বইটির প্রকাশক সংস্থা ‘দ্য ইনস্টিটিউট ফর কন্টেম্পোরারি হিস্ট্রি’।

‘মাইন কাম্ফ’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। হিটলার তার আরও ৮ বছর পরে জার্মানির ক্ষমতায় আসেন। তারপর ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পতন হয় নাৎসি-জার্মানির। পরাজয় নিশ্চিত ধরে নিয়ে হিটলার নিজেও বাঙ্কারে আত্মহত্যা করেন। ‘মাইন কাম্ফ’ অপ্রকাশিত সেই বছর থেকেই। আর বইটির স্বত্ব চলে যায় দক্ষিণ জার্মানির ব্যাভেরিয়ার প্রাদেশিক সরকারের হাতে। বইটি ফের প্রকাশ হলে দেশে ঘৃণা ছড়াতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই ‘মাইন কাম্ফ’-এর পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ করা হয় সরকারি তরফে। তবে এত দিন মূল বাধা ছিল গ্রন্থস্বত্বের।

এবার লেখক হিটলারের মৃত্যুর ৭০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় সেই বাধাও কাটল। মিউনিখের ইতিহাসবিষয়ক সংস্থাটির দাবি—মূলের হুবহু প্রকাশ নয়, বরং বইটির সঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টিকা-ভাষ্যও জুড়ে দেওয়া হয়েছে; নাৎসিবাহিনীর বর্ণবাদী নীতি নিয়ে হিটলারের নানাবিধ মিথ্যাচার, অসংলগ্ন যুক্তির মধ্যে থেকে সত্যিটা আলাদা করতেই এই সটীক সংস্করণ। সব মিলিয়ে ২ হাজার পাতার বই। যার দাম পড়ছে ৫৯ ইউরো।

- **পকেটে মালা ও ক্রুসের সঙ্গে বুদ্ধ ও হনুমান মূর্তি রাখেন বারাক ওবামা :**

ইউ টিউবে দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা তাঁর সর্বদা সঙ্গে রাখা জিনিসপত্রের তালিকাও পেশ করেছেন। এর মধ্যে আছে ছোট্ট এক হনুমান মূর্তিও। আছে পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া ধর্মীয় মালা, একটি বুদ্ধ মূর্তি, ইথিওপিয়ার একটি কপটিক ক্রস এবং একটি ‘পোকার’ (ক্যাসিনোর) চিপ।

ওবামা জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসে আসার পর, নানা সময়ে নানান পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের কাছ থেকে এগুলি তিনি উপহার হিসেবে পেয়েছেন। যেখানেই যান, গুটিকয়েক ছোট ছোট জিনিস নিজের পকেটে রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ওবামার কথায়, যে কোনও খারাপ থাকা সময়ে, যখন ক্লান্ত লাগে, কোনও কারণে হতাশ বা বিরক্ত, তখন এগুলোর মধ্যে কোনও একটা পকেট থেকে হাতে নিয়ে নেন। আর তাতেই ফিরে পান মনোবল। এবং আবার ফিরে আসেন কাজ করার পূর্ণ উদ্যমের মধ্যে।❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to ____________________ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. ______________________ Date ______________

Name (in block letters) ____________________

Category Student / Academician / Institution / Others

Address ____________________

____

PIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Phone ____________________

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

March, 2016
R.N.I. No. 19740/69

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about Yojana (Bengali)

to be published in the first issue every year after the last day of February

1.	Place of publication	:	Kolkata
2.	Periodicity of its publication	:	Monthly
3.	Printer's Name	:	Dr. Sadhana Rout
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Publications Division Soochna Bhawan New Delhi - 110 003
4.	Publisher's Name	:	Dr. Sadhana Rout
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Publication Division Soochna Bhawan, New Delhi - 110 003
5	Editor's Name	:	Pompi Sharma Raychaudhuri
	Nationality	:	Indian
	Address	:	Yojana (Bengali) Publications Division 8, Esplanade East, Kolkata - 700 069
6.	Name and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	:	Ministry of Information & Broadcasting Government of India New Delhi - 110 001

I, Sadhana Rout, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 01/03/2016

(Dr. Sadhana Rout)
Signature of Publisher

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।